# Kakababu O Black Panther

## by Sunil Gangopadhyaya

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার
www.MurchOna.com
মূর্ছনা
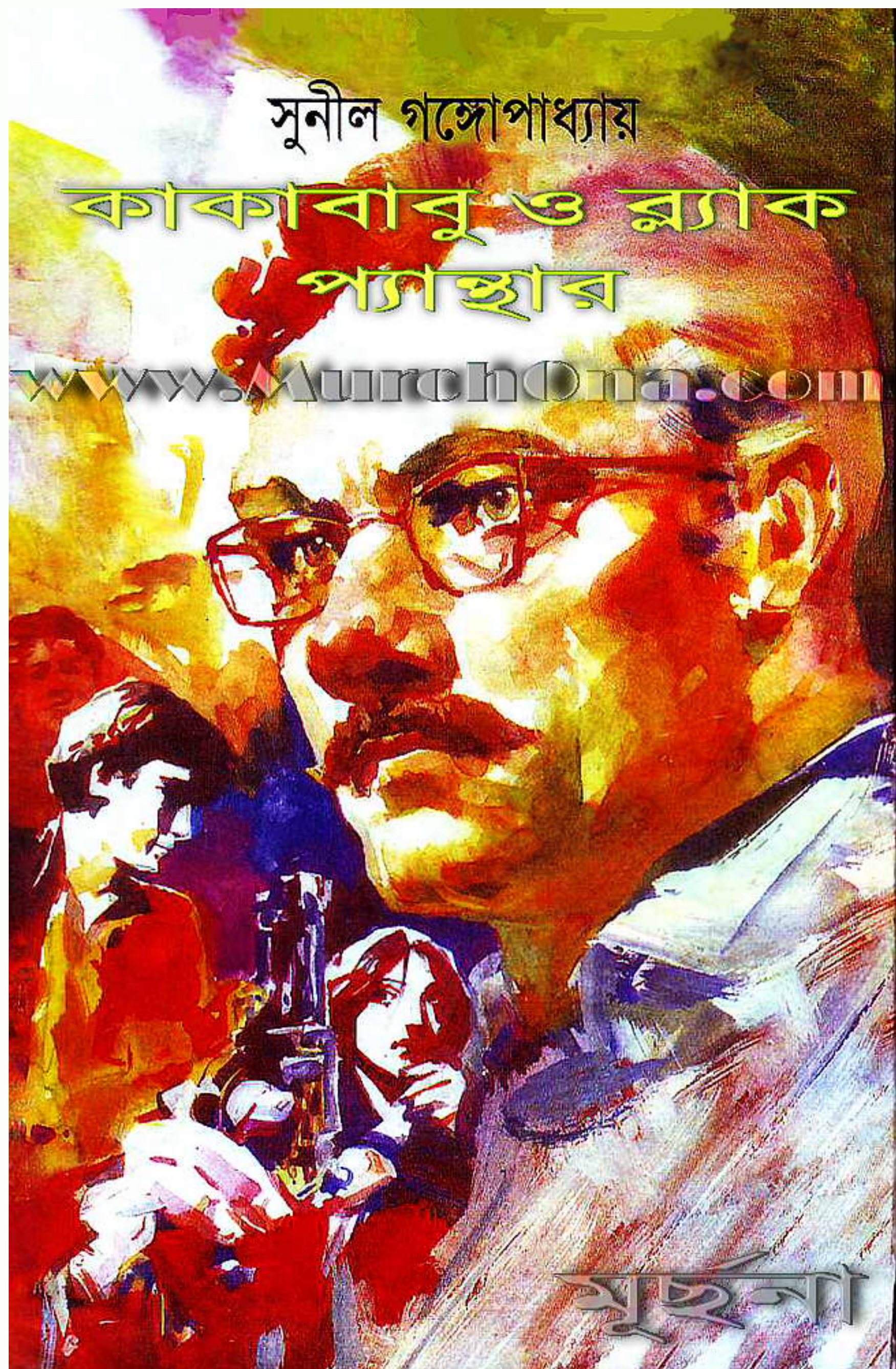
# কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার

সদর দরজা খুলে দিয়ে সন্তু দেখল, বাইরে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তারই সমবয়েসি। জিন্‌স আর হলুদ টি-শার্ট পরা। খুব ফরসা রং, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে।

প্রথম থেকেই সন্তুর মনে হল, এ কলকাতার ছেলে নয়। কেন এরকম মনে হয়, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। তার মুখের ভাবে কিংবা দাঁড়াবার ভঙ্গিতে যেন খানিকটা আড়ষ্টতা আছে। কয়েক পলক সোজাসুজি তাকিয়ে থেকে ছেলেটি বুকের কাছে হাতজোড় করে বলল, "নমস্কার। আমার নাম পুড়ু হ্যালডার। আমার বাবার নাম জি সি হ্যালডার। আমি কাকাবাবু ভদ্রলোকের সঙ্গে মিট করটে, না, ভিজিট করটে, না, সাক্ষাৎ করটে এসেছি।"

এর কথা বলার ভঙ্গিও শুধু যে আড়ষ্ট তাই নয়, মনে হয় যেন মুখস্থ বলছে।

অ-বাঙালিরা যখন ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলে, তা একরকম শোনায়। আর সাহেবদের দেশের লোকরা যে ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলে, তা অন্যরকম। বোঝাই যায়, এ-ছেলেটি এসেছে সাহেবদের দেশ থেকে।

সন্তু বলল, "ভেতরে আসুন।"

ছেলেটি বলল, "আপনার নাম জানটে পারি কি ?"

"হ্যাঁ। সুনন্দ রায়চৌধুরী।"

"গ্ল্যাড টু মিট য়ু। না, না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভেরি প্লিজ্‌ড, না, খুব খুশি হয়েছি। কোথায় ঝুটো খুলতে হবে ?"

"কী খুলতে হবে ?"

"ঝুটো, ঝুটো!"

ছেলেটি আঙুল দিয়ে পায়ের দিকে দেখাতে সন্তু বলল, "ও, জুতো ? না, খুলতে হবে না।"

ছেলেটি বলল, "কাডা।"

সন্তু বলল, "কাডা ? মানে, কাদা লেগেছে ? তা হলে দরজার পাশে খুলে রাখুন।"

ছেলেটি নিচু হয়ে জুতো খোলার পর কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা সুদৃশ্য প্যাকেট বার করে বলল, "দিস ইজ আ গিফ্‌ট ফর ইউ।"

সন্তু বলল, "আমার জন্য ? থ্যাঙ্ক ইউ। কাকাবাবুর সঙ্গে আপনার কী দরকার, তা আমাকে বলবেন কি ? এই সময় উনি একটু ব্যস্ত থাকেন।"

ছেলেটি বলল, "আমার বাবা কাকাবাবু ভদ্রলোককে একটা মেসেজ, না, না, একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি সেটা নিজের হাটে দিটে চাই।"

"ঠিক আছে, ওপরে চলুন।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "ইফ আর রিমেম্বার কারেক্টলি, এ-বাড়িতে সন্তু নামে কেউ থাকে ?"

সন্তু বলল, "আমারই ডাকনাম সন্তু।"

ছেলেটি সন্তুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "আমি পুড়ু। আমার কোনও নিক নেইম নেই। আপনাকে আমি টুমি বলতে পারি ?"

সন্তু বলল, "নিশ্চয়ই। আমিও তুমি বলব। তুমি কোথা থেকে এসেছ ?"

ছেলেটি বলল, "ডাক্‌কি, ডাক্‌কি। ডাক্‌কিনেশোয়ার।"

সন্তু বলল, "দক্ষিণেশ্বর ? এখন সেখান থেকে আসছ ? তার আগে কোথায় ছিলে ?"

ছেলেটি বলল, "কানেটিকাট!"

কাকাবাবু যথারীতি বসে আছেন ইজি চেয়ারে। পাজামা আর গেঞ্জি পরা। সামনের একটা টেবিলে অনেক বই আর কাগজপত্র ছড়ানো। আর একটা কফির কাপ। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন টেলিফোনে।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। কাকাবাবু সন্তুর সঙ্গে একটি অচেনা ছেলেকে দেখে চোখের ইঙ্গিতে চেয়ারে বসতে বললেন, কিন্তু ছেলেটি বসল না।

টেলিফোনে কথা শেষ করার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, এ ছেলেটি কে ?"

সন্তু কিছু বলার আগেই ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কে ?"

ছেলেটি বলল, "মাই নেইম, সরি। আমার নাম পুড়ু হ্যালডার। কাকাবাবু, আপনি আমার রেসপেক্‌ট, রেসপেক্‌ট, আই মিন, রেসপেক্‌ট..."

সন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে সে কাতরভাবে জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট ইজ দা বাংলা ফর রেসপেক্‌ট ?"

সন্তু বলল, "শ্রদ্ধা, ভক্তি।"

ছেলেটি বলল, "থ্যাঙ্কস! ইয়েস, কাকাবাবু, আপনি আমার শ্রড্ডা আর ভক্‌টি গ্রহণ করবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ। তা তুমি কার কাছ থেকে এসেছ ?"

ছেলেটি বলল, "মাই ফাদা... আমার বাবার নাম জি সি হ্যালডার। আপনি নিশ্চিট ভাল থাকসেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যালডার ? তার মানে হালদার। জি সি ? জি সি ?"

ছেলেটি তার ব্যাগ থেকে একটা বড় সাদা খাম বার করে এগিয়ে দিল কাকাবাবুর দিকে।

খামটা সেলোটেপ দিয়ে আঁটা। খোলার বদলে সেটা ছিঁড়ে ফেলতে হল।

একটা সাদা কাগজে শুধু গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে লেখা :

*ওরে শেয়াল,*
*বনগাঁয়ে কেমন রাজত্ব চালাচ্ছিস ?*

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সে-দিকে। তারপর চিঠিটা সন্তুকে দেখিয়ে বললেন, "কিছু বুঝতে পারছিস ?"

সন্তু কিছু বুঝতে পারল না, কিন্তু কাকাবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। ছেলেটিকে বললেন, "তুমি বোসো।"

ছেলেটি বসল না, পাশের টেবিলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইজ দ্যাট ইয়োর কম্পিউটার?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

ছেলেটি বলল, "মে আই, আমি কি, ইউজ, আই মিন ব্যবহার করটে পারি?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

ছেলেটি প্রায় ছুটে গিয়ে কম্পিউটারের সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। কম্পিউটারটা চালুই ছিল, সে কি-বোর্ডটা টেনে নিয়ে শুরু করে দিল খটাখট।

সন্তুও এখন কম্পিউটার ব্যবহার করতে শিখেছে। সে গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটির পাশে। তখনই আবার বেল বেজে উঠল নীচের সদর দরজার। রঘু এই সময় বাজারে যায়, সন্তুকেই দরজা খুলতে হয়।

এবারে দরজা খুলে দেখল, মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বেশ লম্বাচওড়া চেহারা, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা। তাঁর পেছনে একজন শাড়ি পরা মহিলা, গায়ের রং মেমসাহেবদের মতন ফরসা, তবু বাঙালি বলে বোঝা যায়।

সন্তু ভদ্রলোকটিতে চিনতে পারল না, কিন্তু মহিলাটিকে একটু একটু চেনা মনে হল।

ভদ্রলোক বললেন, "কী রে, তুই সন্তু না? ইস, কত বড় হয়ে গেছিস!"

মহিলাটি বললেন, "বড় হবে না? বয়েস কি কারুর থেমে থাকে? প্রায় আট বছর পরে এলাম।"

ভদ্রলোক বললেন, "আট না, ন' বছর। কেমন আছিস রে সন্তু? তোর মা-বাবা কেমন আছেন? তোর বাবা আমার মাস্টারমশাই ছিলেন, চল আগে তাঁকে প্রণাম করব।"

সন্তু বলল, "মা-বাবা ভাল আছেন। ক'দিনের জন্য বেড়াতে গেছেন শান্তিনিকেতনে।"

ভদ্রলোক বললেন, "ওঁরা বাড়ি নেই? আর তোর কাকা, সে-ও গেছে?"

সন্তু বলল, "না, কাকাবাবু আছেন। ওপরে চলুন।"

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী করছে?"

সন্তু বলল, "বনগাঁয়ে রাজাগিরি করছেন।"

ভদ্রলোক হেসে ফেলে বললেন, "বুঝেছিস তা হলে? স্মার্ট বয়!"

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "মানে কী হল?"

ভদ্রলোক বললেন, "ওর কাকার সঙ্গে আমি এক ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি। ওর নাম তো রাজা, আমরা ওকে বলতাম বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা! তবে, ও ছিল সব ব্যাপারে আমাদের লিডার। ইস্কুলের বন্ধুরা আমাকে কী বলে ডাকত জানো? গোবর্ধন! গৌ থেকে গোবর, তার থেকে গোবর্ধন!"

মহিলা বললেন, "বাবা রে বাবা, কীসব অদ্ভুত নাম!"

সন্তুর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল। সে বলল, "আপনি তো মিলিকাকিমা?"

দু'জনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ভদ্রলোক বললেন, "এতক্ষণ চিনতে পারিসনি বুঝি? কাকিমাকে আগে চিনলি কী করে? আমি গৌতমকাকু।"

এক-একজনকে এক-একটা বিশেষ কারণে মনে থেকে যায়। মিলিকাকিমা মাঝে-মাঝেই বলেন, "বাবা রে বাবা!" তখন তাঁর নীচের ঠোঁটটা উলটে যায়, তাঁকে আরও সুন্দর দেখায়।

ওঁদের দু'জনকে দেখেই কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। গৌতমকাকুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কী রে কেমন আছিস? কবে এলি, আগে থেকে কোনও খবরও দিসনি! মিলি, তুমি তো একই রকম আছ দেখছি।"

গৌতমকাকু বললেন, "খবর দিইনি, তোকে চমকে দেওয়ার জন্য। ফোনও করিনি। আমাদের ছেলেটা এসেই কম্পিউটারে বসে গেছে? দক্ষিণেশ্বরে মামার বাড়িতে উঠেছি।

সে-বাড়িতে কম্পিউটার নেই, তাই ছটফট করছিল। এই বয়েসের এরা তো কম্পিউটারের পোকা!"

কাকাবাবু বললেন, "তোর ছেলেকে চিঠিটা দেখার আগে চিনতে পারিনি। বাবার নাম বলেছে জি সি হ্যালডার। যদি বলত গোবর্ধন..."

মিলিকাকিমা বললেন, "এই, ওরকম বিচ্ছিরি নামে ডাকবে না।"

গৌতমকাকু বললেন, "গোবর্ধন বিচ্ছিরি তো নয়। আমার বেশ ভাল লাগে। আমাদের ছেলেটা ঠিকঠাক এসে বাংলায় কথা বলেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ও তো সুন্দর বাংলা কথা বলে।"

গৌতমকাকু বললেন, "ওদেশের ছেলেমেয়েরা বাংলা শিখতেই চায় না। আমরা অবশ্য সবসময় ছেলের সঙ্গে বাংলায় কথা বলি। এখানে কোনও বাড়িতে যাওয়ার আগে আগে ওকে একলা পাঠিয়ে দিয়ে দেখি সব ঠিকঠাক বলতে পারে কি না!"

কাকাবাবু বললেন, "সবই ঠিক বলেছে। তবে ওর নামটা বুঝতে পারলাম না। পুডু ? এটাই ওর ভাল নাম ?"

গৌতমকাকু বললেন, "পুডু নয়, পুরু। ও যখন জন্মায়, তখন আমরা গ্রিসে ছিলাম। অনেকে বলল, ছেলের নাম রাখো আলেকজান্ডার! আমি বললাম, কেন ? আমরা ভারতীয়। আলেকজান্ডার ভারতে গিয়ে মহারাজ পুরুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই বীরের প্রতি বীরের মতন ব্যবহার, মনে নেই ? ওর নাম সেই পুরু।"

কাকাবাবু বললেন, "পুরু ? বেশ ভাল নাম। পুডু শুনে ধরতে পারিনি।"

গৌতমকাকু বললেন, "আমরা তো বাঙাল, তাই র আর ড়-এর গোলমাল হয়ে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই বাঙাল হতে পারিস, ও কী করে বাঙাল হবে ? ও কি ওসব দেশ দেখেছে ?"

গৌতমকাকু বললেন, "রক্তের মধ্যে থেকে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "অধিকাংশ সাহেব ত উচ্চারণ করতে পারে না কেন বুঝি না। তুমি-কে বলে টুমি, আস্তে-কে বলে আস্‌টে। আমরা তো ত আর ট দুটোই বলতে পারি।"

গৌতমকাকু বললেন, "হ্যাঁ, এটাই মজার ব্যাপার। ত বলতে পারে না, থ আর দ পারে, কিন্তু ধ বলতে অসুবিধে হয়। আর চন্দ্রবিন্দু তো একেবারেই অসম্ভব। কোনও সাহেব চাঁদ বলতে পারবে না।"

মিলিকাকিমা বললেন, "বাঙালরাও চাঁদ বলতে পারে না। ফাঁদ বলতে পারে না।"

গৌতমকাকু বললেন, "এই তো আমি বলতে পারি, চাঁদ, চাঁদ, চাঁদ। ফাঁদ, ফাঁদ, ফাঁদ। কাঁদো নদী কাঁদো। বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও! আমি সব চন্দ্রবিন্দু পারি। আমার ছেলেরও সব উচ্চারণ ঠিক করে দেব!"

এই সময় রঘু দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "চা-কফি কিছু লাগবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, লাগবে।"

গৌতমকাকু বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, এ রঘু না ? কতকালের পুরনো লোক। কী রঘু, আমায় চিনতে পারছ ?"

রঘু বলল, "কেন পারব না। আপনি তো সেই গোবর্ধন দাদাবাবু।"

সবাই হেসে উঠল। শুধু মিলিকাকিমা ঠোঁট উলটে বললেন, "বাবা রে বাবা!"

পুরু এমন একমনে কম্পিউটার দেখে যাচ্ছে যে, অন্য কিছু যেন শুনছেই না।

গৌতমকাকু বললেন, "রঘু, ছোটবেলায় আমি যখন এ-বাড়িতে আসতাম, তখন এ-পাড়ার একটা দোকানে খুব ভাল শিঙাড়া পাওয়া যেত, ভেতরে কিশমিশ দেওয়া। সেই শিঙাড়া খাওয়াবে ?"

রঘু একগাল হেসে বলল, "সে-দোকানটা কবে উঠে গেছে' এখন সেখানে দরজির দোকান।"

সন্তু বলল, "হাজরার মোড়ে একটা দোকানে ভাল শিঙাড়া পাওয়া যায়, নিয়ে আসব ?"

মিলিকাকিমা বললেন, "না না, শিঙাড়া খেতে হবে না। খেলেই ওর পেট খারাপ হবে।"

গৌতমকাকু বললেন, "হোক পেট খারাপ। তবু খাব। কলকাতায় এসে শিঙাড়া না খেলে চলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোদের ওদেশে শিঙাড়া পাওয়া যায় না ? আজকাল তো শুনেছি সবই পাওয়া যায়।"

গৌতমকাকু বললেন, "পাওয়া যায় মাঝে-মাঝে। কিন্তু কলকাতার মতন কি স্বাদ হয় ? যা তো সন্তু, নিয়ে আয়। পুরুকেও সঙ্গে নিয়ে যা। ও কলকাতার রাস্তাঘাট চিনুক। দোকানে গিয়ে ওকে কথা বলতে দিবি! এই পুরু, ওঠ।"

পুরু বাধ্য ছেলের মতন কম্পিউটার ছেড়ে উঠে এল।

গৌতমকাকু বললেন, "দোকানে গিয়ে পনেরোটা শিঙাড়া কিনবি। কী বলবি ?"

পুরু বলল, "পনেরো মানে হাউ মেনি ?"

গৌতমকাকু বললেন. "পনেরো মানে পনেরো। ফিফ্‌টিন। তোকে বাংলা এক-দুই শিখিয়েছিলাম, ভুলে গেছিস ? সন্তু তোকে ভাল করে বাংলা শিখিয়ে দেবে।"

সন্তু পুরুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবু তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা এখন কোথায় থাকিস ?"

গৌতমকাকু বললেন, "কানেটিকাট। বাংলায় যাকে বলে কানেকটিকাট। নিউ ইয়র্কের পাশেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তোরা তা হলে ওদেশেই থেকে গেলি, আর ফিরবি না ?"

গৌতমকাকু বললেন, "আর কি ফেরা হবে ? ছেলেটা ওদেশে পড়ছে। এখন এখানে এলে পড়াশুনোয় সুবিধে করতে পারবে না। মিলি আর আমি হয়তো বুড়ো বয়েসে ফিরে আসব। পুরু ওদেশে থেকে গেলেও ও যাতে বাঙালি পরিচয়টা ভুলে না যায়, সে চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওকে আমি বাংলাটা ভাল করে শেখাবই। বাংলা বইটই পড়তে পারে।"

মিলিকাকিমা বললেন, "বাবা রে বাবা! তুমি এক-একসময় এত বাড়াবাড়ি করো। ছেলেটা বাংলা কথা খুঁজে না পেয়ে হাঁসফাঁস করে।"

গৌতমকাকু বললেন, "আর একটা বছর চাপে রাখলেই ও সব শিখে যাবে। তোমাকে বারণ করেছি না, ওর সঙ্গে কক্ষনও ইংরিজিতে কথা বলবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু বই পড়ে কি বাংলা শেখা যায় ? দেশটাকেও চেনাতে হয়। তুই নিজেও তো পশ্চিমবাংলার অনেক কিছুই দেখিসনি।"

গৌতমকাকু বললেন, "দেখব কী করে ? উনিশ বছর বয়েসে বিদেশে চলে গেছি। মিলির বাপের বাড়ি কানপুরে, ও কলকাতা ছাড়া আর কিছুই চেনে না। কলকাতার এত কাছে সুন্দরবন, তাও কখনও যাওয়া হয়নি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চা বাগান দেখেছিস ?"

মিলিকাকিমা বললেন, "শুধু ছবিতে দেখেছি। বিদেশেও দার্জিলিং-এর চায়ের খুব নাম। অনেক সাহেব-মেমও জিজ্ঞেস করে, এ তো তোমাদের দেশের চা, তোমরা সে চা-বাগান দ্যাখোনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "উত্তরবঙ্গ ভর্তি চা-বাগান। সেখানে অনেক জঙ্গলও আছে। আর কালিম্পং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য কী অপূর্ব। আরও কত ভাল ভাল জায়গা আছে।"

গৌতমকাকু বললেন, "রাজা, তা হলে এক কাজ করা যাক। তোর হাতে কি এখন খুব কাজ আছে ? না থাকলে, চল না, সবাই মিলে কোনও একটা জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি কয়েকদিনের জন্য। তুই যে-জায়গা ঠিক করবি, আমরা সেখানেই যাব।"

মিলিকাকিমা বললেন, "তা হলে খুব ভাল হয়। চলুন না, প্লিজ চলুন। আমার চা-বাগান দেখারই খুব ইচ্ছে।"

॥ ২ ॥

পুরু এ-বাড়িতেই থেকে গেছে। সন্তুর কাছে সে ভাল করে বাংলা শিখবে।

পুরু কোনওদিন ট্রামে চাপেনি। ভিড়ের বাস দেখলে সে আঁতকে ওঠে। রাস্তা পার হওয়ার সময় সে সন্তুর হাত চেপে ধরে থাকে।

সন্তু জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের দেশেও তো অনেক গাড়ি। সেখানে রাস্তা পার হও কী করে?"

পুরু হাসে। রাস্তায় সে তো গাড়িতেই থাকে। ওদের ওখানে রাস্তা দিয়ে বিশেষ কেউ হাঁটে না। সবাই গাড়ি চেপে পার্কে গিয়ে সেখানে হাঁটে কিংবা দৌড়য়।

সন্তু বলে, "তার মানে, তোমাদের দেশে পথিক নেই?"

বুঝতে না পেরে পুরু জিজ্ঞেস করে, "হোয়াট ইজ পথিক?"

সন্তু বলে, "রাস্তার আর-একটা নাম পথ। পথ দিয়ে যারা হাঁটে, তারা পথিক। তুমি আর আমি এখন পথিক।"

পুরু বলে, "পথিক। পথিক। বাঃ। আই অ্যাম আ পথিক। সাউন্ডস গুড!

সন্তু বলে, "উঁহুঃ, অত ইংরিজি বললে তো চলবে না। তোমার বাবা বারণ করেছেন। সাউন্ডস গুড, বাংলায় কী হবে?"

পুরু বলল, "ভাল শব্দ হয়।"

সন্তু বলল, "না, ঠিক হল না। শুনতে ভাল লাগে।"

পুরু জিজ্ঞেস করল, "ওই লোকটি কী সেল করছে?"

"সেল নয়। বিক্রি। ও ফুচকা বিক্রি করছে।"

"পুচকা?"

"পুচকা নয়, ফুচকা।"

"ফুসকা?"

"ফুসকা শুনলে মনে হবে ফোসকা! ফোসকা নয়, ফুচকা, খাবার জিনিস।"

"আমি কেতে পারি?"

"কেতে নয়, খেতে। আমরা তো খুব খাই। তুমি খেলে যদি তোমার পেটের অসুখ হয়? তোমাদের তো রাস্তায় জল খাওয়া বারণ।"

"তবু খেয়ে ডেকটে চাই।"

"ডেকটে নয়, দেখতে। ঠিক আছে, একটা মোটে খাও।"

একটা ফুচকা খাওয়ার পর পুরু বলল, "ডেলিশাস। ভাল, খুব ভাল।" পর পর চারটে ফুচকা খেয়ে ফেলল পুরু।

পেছন থেকে সন্তুর পিঠে চাপড় মেরে একজন বলল, "কী রে, একা-একা ফুচকা খাওয়া হচ্ছে?"

মুখ ফিরিয়ে সন্তু বলল, "জোজো! আমরা তো তোর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। একা নয় রে, এই আমাদের নতুন বন্ধু, এর নাম পুরু। আলেকজান্ডারের দেশ গ্রিসে ওর জন্ম।"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "আমারও জন্ম নেপোলিয়ানের দেশ কার্সিকায়। তাই আমার আর-একটা নাম কৌশিক।"

সন্তু বলল, "ওরা এখন আমেরিকার কানেটিকাটে থাকে।"

জোজো বলল, "আমিও কানেটিকাটে থেকেছি। বাবা যেবারে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ভূতের ভয়ের চিকিৎসা করতে গেলেন, তখন প্রেসিডেন্ট সাহেব চুপি চুপি কানেটিকাটের একটা বাড়িতে আসতেন। কাছেই তো সমুদ্র, তাই না?"

পুরু অবাক হয়ে দেখছে জোজোকে।

সন্তু বলল, "পুরু আগে কখনও ফুচকা খায়নি।"

জোজো বলল, "কেন, আমেরিকাতেও তো ফুচকা পাওয়া যায়। তবে, ওখানে তেঁতুল জলের বদলে ভেতরে আইসক্রিম ভরে দেয়।"

পুরু এবার জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট ইজ টেঁটুল ?"

সন্তু বলল, "তেঁতুল, একরকমের টক টক ফল।"

পুরু জিজ্ঞেস করল, "কোন গাছে হয় ?"

জোজো বলল, "অদ্ভুত প্রশ্ন। আম কোন গাছে হয় ? আম গাছে। জাম কোন গাছে হয় ? জাম গাছে। তেমনি তেঁতুলও হয় তেঁতুল গাছে। ফলের নামেই গাছের নাম। কিংবা গাছের নামে ফলের নাম।"

সন্তু বলল, "ও তো অত কিছু জানে না। তেঁতুল গাছ কখনও দেখেইনি।"

জোজো বলল, "আমিও তো আখরোট গাছ দেখিনি। তা বলে কি ভাবব, আখরোট হয় কলা গাছে ?"

সন্তু এবার হেসে ফেলে বলল, "তুই দেখিসনি, এমন কিছু কি আছে পৃথিবীতে ? সত্যিই তুই আখরোট গাছ দেখিসনি ?"

জোজো বলল, "একবার মাত্র দেখেছি, ম্যাডাগাস্কারে। ভাল মনে নেই।"

পুরু আস্তে-আস্তে বলল, "আমি একটা টেঁটুল গাস দেকব!"

জোজো ভুরু তুলে বলল, "টেঁটুল আবার কী ? গাস ?"

সন্তু বলল, "ও ভাল বাংলা জানে না।"

জোজো বলল, "তা বলে গাছকে গাস বলবে ? ঘাস খায় নাকি ? এ জংলি ভূতটাকে কোথায় পেলি রে সন্তু ?"

সন্তু বলল, "জংলি ভূত কী বলছিস। ও আমেরিকায় থাকে।"

জোজো বলল, "আমেরিকায় বুঝি জংলি ভূত নেই ? অনেক আছে।"

সন্তু বলল, "আর কতক্ষণ এরকম চালাবি রে জোজো ?"

তারপর পুরুর দিকে ফিরে বলল, "তুমি কিছু মনে কোরো না। কারও সঙ্গে প্রথম আলাপে জোজো এইরকম ইয়ার্কি-ঠাট্টা করে।"

জোজো এবার হাত বাড়িয়ে পুরুর একটা হাত ধরে বলল, "গ্ল্যাড টু মিট ইউ। আমার নাম জোজো।"

সন্তু বলল, "ওর সঙ্গে ইংরিজি বলবি না। ও বাংলা শিখছে।"

জোজো বলল, "কোনও চিন্তা নেই। আমি সাতদিনে ওকে এমন বাংলা শিখিয়ে দেব— ও নিজেই অবাক হয়ে যাবে। প্রথমেই ওকে একটা তেঁতুল গাছ দেখাতে হবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাছে একটা বড় ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ আছে, চল সেখানে যাই।"

সন্তু বলল, "দাঁড়া, এখন যাব না। একটা কাজের কথা আছে। পরশুদিন আমরা একটা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি। তুই যাবি তো ?"

জোজো বলল, "কোথায় ?"

সন্তু বলল, "উত্তরবঙ্গে। এখান থেকে ট্রেনে করে যাব, তার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গাড়িতে— একটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে থাকব। ফরেস্ট বাংলো রিজার্ভ করা আছে।"

পুরু বলল, "এই, টোমরা এত ইংলিশ বলছ কেন ? ট্রেনে, ফরেস্ট বাংলো, রিজার্ভ।"

জোজো বলল, "আমরা কিছু কিছু ইংরিজি শব্দ বলি, সেগুলোও বাংলা হয়ে গেছে। চেয়ার, টেবিল, আলমারি এগুলোর বাংলাই হয় না। ট্রেন, হ্যাঁ, ট্রেনও বাংলা।

সন্তু বলল, "বইতে পড়েছি, আগে লোকেরা রেলগাড়ি বলত। এখন আর কেউ বলে না।"

পুরু বলল, "কোনটা কোনটা ইংরিজিটা বাংলা হবে না, হাউ ডু ইউ, মানে কী করে বুঝা যাবে ?"

জোজো বলল, "শুনতে শুনতে বুঝে যাবে।"

পুরু বলল, "ফরেস্ট মানে তো ঝংগল।"

জোজো বলল, "ঝংগল নয়, জঙ্গল। বনজঙ্গল। সবসময় আমরা ফরেস্ট বলি না, বন কিংবা জঙ্গলই বলি। ফরেস্ট বাংলোটাও বন-বাংলো হতে পারে। তবে বাংলোটা বাংলোই।"

সন্তু বলল, "জোজো, পরশুদিন ঠিক সন্ধে সাতটায় তোকে আমরা বাড়ি থেকে তুলে নেব!"

জোজো বলল, "পরশুদিন? এই রে! পরশুদিন তো যেতে পারব না।"

সন্তু বলল, "কেন?"

জোজো বলল, "তোরা আর দু'-একদিন পরে যেতে পারিস না?"

সন্তু বলল, "ট্রেনের টিকিট কেনা হয়ে গেছে। তোরও টিকিট আছে। বাংলো ঠিক করা আছে। পুরুরা বেশিদিন থাকবে না। আর তো পেছোনো যাবে না।"

পুরু বলল, "টিকেট?"

সন্তু বলল, "তোমরা বলো টিকেট, আমরা বাংলায় বলি টিকিট। টিকেটও চলতে পারে, তার আর বাংলা করার দরকার নেই।"

জোজো বলল, "পরশুদিনই আমার এক মাসির বিয়ে। সেদিন আমায় থাকতেই হবে। মা কিছুতেই ছাড়বে না।"

সন্তু বলল, "তা হলে তুই পরের দিন চলে আয়। কিংবা তার পরের দিন।"

জোজো বলল, "আমি একলা একলা কী করে যাব?"

সন্তু বলল, "ট্রেনের টিকিটটা বদলে নিলেই হবে। ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, মানে জেলাশাসক, কাকাবাবুর খুব চেনা। তাঁর কাছে খোঁজ করলেই তিনি তোকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।"

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "একা একা কি আর যেতে ইচ্ছে করবে?"

পুরু বলল, "আমি একা বস্টনে যেতে পারি।"

জোজো বলল, "বস্টনে যাওয়া আর জঙ্গলে যাওয়া কি এক, বল ভাই?"

সন্তু বলল, "চলে আয়, চলে আয়।"

জোজো বলল, "তুই আমাকে নিয়ে যেতে চাস না।"

সন্তু বলল "সে কী রে? তোর টিকিট পর্যন্ত কাটা হয়ে গেছে। এর মধ্যে হঠাৎ তোর মাসির বিয়ে হবে, তা কী করে জানব? তোর কত মাসি রে?"

জোজো বলল "পঁচানব্বইজন।"

সন্তু বলল, "মোটে? আরও পাঁচজন বেশি হওয়া উচিত ছিল।"

॥ ৩ ॥

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন পৌঁছল সকালবেলা।

কলকাতার তুলনায় এখানে শীত একটু বেশি। মেঘ নেই, ঝকঝক করছে নীল আকাশ।

স্টেশনের বাইরে এসে গৌতমকাকু জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে বললেন, "বাঃ, এখানকার বাতাস অনেক টাটকা। পলিউশান ফ্রি!"

পুরু বলল, "ড্যাড, টুমি ইংরাজি বলছ?"

গৌতমকাকু বললেন, "ওঃ হো। পলিউশানের বাংলা কী হবে রে, রাজা?"

কাকাবাবু বললেন, "পলিউশান, সবাই তো পলিউশানই বলে। বাংলা আছে। কী বলতো সন্তু?"

সন্তু বলল, "দূষণ।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দূষণ। বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ।"

মিলিকাকিমা বললেন, "বাবা রে বাবা! আমি অত শক্ত শক্ত বাংলা বলতে পারব না।"

আগেই ঠিক হয়েছে, এখানে যে-ক'টা দিন থাকা হবে, তখন কেউ ইংরেজি বলতে পারবে না। পুরুকে বাংলা শেখাতে হবে তো! একটা ইংরেজি শব্দ বললেই জরিমানা হবে। ছোটদের দশ পয়সা, বড়দের এক টাকা।

গৌতমকাকু বললেন, "ঠিক আছে, আমার এক টাকা জরিমানা হল। সন্তু, হিসেব রাখিস। আর পুরু, তোরও দশ পয়সা।"

পুরু অবাক হয়ে বলল, "কেন, আমার কেন ?"

গৌতমকাকু বললেন, "তুই যে ড্যাড বললি! এখানে বাবা বলতে হবে!"

একজন গাড়ির ড্রাইভার হাতে একটা বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে লেখা, রাজা রায়চৌধুরী।

সেই গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে কাকাবাবু বললেন, "প্রথমে আমাদের যেতে হবে জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে। এই রে, সার্কিট হাউসের বাংলা তো জানি না। এটা বাদ দাও। যেমন, হোটেলেরও বাংলা করার দরকার নেই, এখানকার ইয়ে, মানে জেলাশাসক আমার এক বন্ধুর ছেলে। সে বিশেষ অনুরোধ করেছে, দুপুরে ওখানে খেয়ে যেতে হবে। তারপর বন বাংলোয় পৌঁছে দেবে।"

গৌতমকাকু বললেন, "তা বেশ তো! সারারাত ট্রেনজার্নি করে এসে ওখানে স্নানটানও করে নেওয়া যাবে!"

সন্তু বলল, "আপনার দু' টাকা।"

গৌতমকাকু বললেন, "কেন ? ও, ট্রেনজার্নি বলেছি। কী হবে, ট্রেনযাত্রা ?"

মিলিকাকিমা বললেন, "বাবা রে বাবা! সবাই ট্রেনজার্নি বলে!"

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু বললেন, "আর একবার বিজয়নগরে যাওয়ার পথে আমরা এই বাংলা-বাংলা খেলেছিলাম, ওই যে রঞ্জন আর রিঙ্কু আমাদের সঙ্গে ছিল, সেবারে কে জিতেছিল রে সন্তু ?"

সেবারে সন্তুই জিতেছিল। কিন্তু সে-কথা না জানিয়ে সে বলল, "ঠিক মনে নেই।"

সার্কিট হাউজে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল।

মস্তবড় বাড়ি। সামনে চমৎকার বাগান। অনেকগুলি বড় বড় ঘর।

গৌতমকাকু যা দেখেন, তাতেই খুশি হয়ে ওঠেন। তিনি বললেন, "বাঃ, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তো।"

ঘরে গিয়ে বসতে-না-বসতেই চা-জলখাবার এসে গেল। আর একটু পরেই এলেন জেলাশাসক রণবীর গুপ্ত। বয়েস খুব বেশি নয়, অত্যন্ত সুপুরুষ। তিনি প্রথমেই কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, "কাকাবাবু, আমার বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবা সোমনাথকে টেলিফোন করেছিলাম। সে বলল, তার হাঁটুতে ব্যথা, তাই আসতে পারবে না।"

রণবীর বললেন, "বাবা কিছুতেই আসতে চান না। কলকাতা থেকে বেরুতেই চান না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবা পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত থাকে। একবার জোর করে ধরে নিয়ে এসো।"

তারপর তিনি অন্যদের সঙ্গে রণবীরের আলাপ করিয়ে দিলেন।

রণবীর সন্তুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "কী হে সন্তু মাস্টার, এখানেও কোনও অ্যাডভেঞ্চার হবে নাকি ? অন্ধকার গুহার মধ্যে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে ময়াল সাপ, দস্যু সর্দার মোহন সিং, হাতির পাল গাড়ি উলটে দিল!"

সন্তু লাজুকভাবে বলল, "না, এখানে তো শুধু বেড়াতে এসেছি।"

রণবীর বললেন, "এখানেও কিন্তু ওরকম অনেক কিছু আছে। পরশুই তো জঙ্গল থেকে মস্ত বড় একটা পাইথন ধরে এনেছে, প্রায় দশ হাত লম্বা!"

মিলিকাকিমা বললেন, "ওরে বাবা, এখানে পাইথন আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পাইথন তেড়ে এসে মানুষকে কামড়ায় না।"

মিলিকাকিমা বললেন, "হরিণ গিলে ফেলে শুনেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "চেষ্টা করে, সবসময় পারে না। বেচারারা বোকা হয়। আমি মধ্যপ্রদেশে একবার দেখেছিলাম, একটা বড় পাইথন একটা শিংওয়ালা মস্ত হরিণকে গেলার চেষ্টা করছিল। শিং-এর কাছে এসে আটকে গেছে। বড় ধারালো শিং তো আর গিলতে পারে না, ওগরাতেও পারছে না। দেখে মনে হচ্ছিল একটা শিংওয়ালা সাপ! সে বেচারা মরেই গেল শেষ পর্যন্ত।"

মিলিকাকিমা বললেন, "আমি পাইথন সাপ দেখতে চাই না, আমি চা-বাগান দেখতে চাই।"

রণবীর বললেন, "চা-বাগান অনেক দেখতে পাবেন। যাওয়ার পথেই। কোনও চা-বাগানের ম্যানেজারকে বলে দিতে পারি, আপনাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে।"

পুরুকে তিনি বললেন, "তুমি চুপ করে বসে আছ। ইজ দিস ইয়োর ফার্স্ট টাইম ইন নর্থ বেঙ্গল?"

পুরু বলল, "ইয়েস, ফার্স্ট টাইম।"

কেউ ইংরেজিতে কিছু জিজ্ঞেস করলে স্বাভাবিকভাবেই তার মুখ দিয়ে ইংরেজি বেরিয়ে আসবে।

তবু বলে ফেলে সে অপরাধীর মতন অন্যদের দিকে তাকাল।

কাকাবাবু হেসে মাথাটা একটু ঝোঁকালেন। অর্থাৎ বুঝিয়ে দিলেন, ঠিক আছে।

রণবীর আরও কিছুক্ষণ ইংরেজি বললেন পুরুর সঙ্গে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমাদের জন্য কোন বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করেছ, রণবীর?"

রণবীর বললেন, "আপনারা তো নিরিবিলিতে থাকতে চান। এখানকার সবচেয়ে নামকরা বাংলো হচ্ছে হলং। কিন্তু সেখানে খুব লোকজনের ভিড়, প্রতিদিন অনেক লোক আসে। আমার খুব ভাল লাগে চাপড়ামারি। একেবারে নির্জন। চতুর্দিকে জঙ্গল। বাংলোটাও সুন্দর। বারান্দায় বসে-বসেই অনেক জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "গোরুমারা বাংলোটাও তো বেশ ভাল।"

রণবীর বললেন, "হ্যাঁ, ওটাও ভাল। কিন্তু একটা সিনেমা পার্টি ওখানে শুটিং করছে, আরও দিনসাতেক থাকবে।"

গৌতমকাকু বললেন, "না, না, আমরা সিনেমা পার্টির ধারেকাছে যেতে চাই না।"

মিলিকাকিমা বললেন, "আমরা শুটিং দেখতে পারব না?"

রণবীর বললেন, "হ্যাঁ, তা দেখতে পারেন, গিয়ে আবার ফিরে আসবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে চাপড়ামারিই ভাল।"

রণবীর বললেন, "ওখানে পুরো বাংলোটাই আপনাদের থাকবে। কেউ বিরক্ত করবে না। তবে, কয়েকজন পুলিশকে আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশ? পুলিশ যাবে কেন?"

রণবীর বললেন, "কাকাবাবু, আপনার তো শত্রুর অভাব নেই। পুলিশ আপনাদের পাহারা দেবে সবসময়।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, কোনও দরকার নেই। আমরা যে এখানে এসেছি, তা তো কেউ জানেই না।"

গৌতমকাকু বললেন, "জঙ্গলে বেড়াতে যাব পুলিশ সঙ্গে নিয়ে? এ কী অদ্ভুত কথা।"

কাকাবাবু বললেন, "রণবীর, তুমি বরং একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়ো। এখানে-সেখানে ঘুরতে যাব।"

রণবীর বললেন, "গাড়ি তো থাকবেই। একজন অন্তত আর্মড গার্ড দিয়ে দিই, আপনাদের প্রোটেকশানের জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "তাও লাগবে না। আমরা পাঁচজন, ড্রাইভার থাকবে, গাড়িতে আর জায়গা হবে কী করে?"

রণবীর বললেন, "আপনাদের কিছু খাবারদাবার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। জঙ্গলে কিছু পাওয়া যাবে না। অনেক দূরে দোকান, বাংলোয় অবশ্য রান্না করার লোক আছে।"

রণবীর সব ব্যবস্থা করতে উঠে গেলেন।

পুরু সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "এই ভদ্রলোক অনেক ইংরাজি শব্দ বলেন। আর্মড গার্ড, প্রোটেকশান—"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমরা অনেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি। তা আর কী করা যাবে।"

গৌতমকাকু বললেন, "যারা লেখাপড়া জানে না, তারাও অনেক ইংরেজি বলে। আমার মামাবাড়িতে যে মেয়েটি বাসন মাজে, সেও বলে, আমার টাইম নেই, ট্রেন লেট ছিল।"

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর যাত্রা শুরু হল। গাড়ির ড্রাইভারের নাম রতন, সে জঙ্গলের রাস্তাটাস্তা সব চেনে।

শহর ছেড়ে খানিকটা যাওয়ার পরই চোখে পড়ল, রাস্তার দু'ধারে চা-বাগান।

মিলিকাকিমা বললেন, "ওমা, চা গাছ এরকম হয় বুঝি? ছবিতে দেখে ঠিক বুঝিনি। যতদূর দেখা যায়, সব গাছ সমান। চা গাছ বড় হয় না?"

কাকাবাবু বললেন, "সমান করে ছেঁটে রাখে। চায়ের পাতা তো হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝুরিতে ভরতে হয়, বেশি লম্বা হয়ে গেলে হাত পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া গাছ বড় হলে বোধ হয় চায়ের স্বাদও ভাল হয় না। সব পাতা দিয়ে চা হয় না। শুধু ডগার কচি পাতা।"

সন্তু বলল, "দুটি পাতা একটি কুঁড়ি।"

গৌতমকাকু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই নামে একটা বই পড়েছিলাম ছেলেবেলায়, চা-বাগানের কুলিদের নিয়ে লেখা। চা-গাছ ঠিক গাছের মতন দেখতে নয়, ঝোপ বলাই উচিত।"

পুরু জিজ্ঞেস করল, "বাবা, ঝোপ মানে কী?"

গৌতমকাকু বললেন, "ঝোপ মানে, ঝোপ মানে, ইয়ে, সন্তু, বুঝিয়ে দে তো!"

সন্তু পুরুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমেরিকার প্রে...প্রে...প্রে... রাষ্ট্রপতির নাম কী?"

পুরু বলল, "জর্জ বুশ।"

সন্তু বলল, "ঝোপ হচ্ছে ওই রাষ্ট্রপতির যা পদবি!"

গৌতমকাকু হেসে বললেন, "সন্তুর সঙ্গে আমরা পারব না। ও নিজের মুখে ইংরেজি কথাটা উচ্চারণ করল না। মহা চালু!"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক সময় ইংরিজি শব্দ দিয়ে বাংলা মানে বোঝাতে হয়।"

মিলিকাকিমা বললেন, "মাঝে-মাঝে এক-একটা গাছ যে লম্বা হয়ে গেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "ওগুলো চা গাছ নয়। ওগুলো রেখেছে ছায়ার জন্য।"

মিলিকাকিমা বললেন, "কুলিরা ওই গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নেয়?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, কুলিদের আরামের কথা কেউ ভাবে না। চায়ের ঝোপেরই ছায়া দরকার। কটকটে রোদ চায়ের পক্ষে ভাল নয়।"

রতন বলল, "ওগুলো স্যার শেড ট্রি।"

কাকাবাবু বললেন, "ছায়া-গাছ।"

মিলিকাকিমা বললেন, "সব বাগান খালি। কেউ তো কাজ করছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন বোধ হয় পাতা তোলার সময় নয়।"

রতন হাত দিয়ে ডান দিকটা দেখিয়ে বলল, "এই গার্ডেনটায় গত শনিবার ডাকাতি হয়ে গেছে।"

মিলিকাকিমা চমকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ, ডাকাতি! এখানেও ডাকাতি?"

গৌতমকাকু বললেন, "ডাকাতি কোথায় না হয়? আমেরিকাতে হয় না?"

রতন বলল, "ডাকাতরা একজন গার্ডকে গুলি করে মেরেছে। আর ম্যানেজারবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে! ওরা দশ-বারোজন ছিল।"

মিলিকাকিমার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, "আমরা জঙ্গলের মধ্যে একলা একলা থাকব?"

কাকাবাবু বললেন, "একলা কোথায়? আমরা পাঁচ-ছ'জন। তা ছাড়া ডাকাতরা আমাদের কাছে আসবে কেন? আমাদের সঙ্গে তো টাকাপয়সা বেশি নেই। ওরা আগে থেকে খবর নিয়ে আসে।"

গৌতমকাকু বললেন, "রাস্তাটা তো বেশ ভালই দেখছি। ভাঙা নেই, গর্ত নেই। দু'পাশের চা-বাগান একেবারে সবুজ, ভারী সুন্দর, মনে হয় কী পিসফুল জায়গা। এর মধ্যেও চোর-ডাকাত!"

সন্তু বলল, "গৌতমকাকু, তোমার এক নম্বর বাড়ল।"

গৌতমকাকু বললেন, "ও, পিসফুল বলে ফেলেছি। শান্তিময়, শান্তিময়।"

কাকাবাবু বললেন, "গৌতম, তুইও ডাকাতির কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলি নাকি? ওরকম ভয় পেলে তো কোনও জায়গায় বেড়াতে যাওয়াই যায় না।"

গৌতমকাকু বললেন, "না, না, ভয় পাইনি। সিনসিনাটিতে তো একদিন আমার চোখের সামনেই ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হয়ে গেল। সন্তু, ব্যাঙ্ক বলতে পারি তো?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের বাংলা নেই। আপনি ডাকাতদের দেখতে পেলেন?"

গৌতমকাকু বললেন, "হ্যাঁ, আমিও তো তখন সেই ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গেছি। ওরা মাত্র তিনজন, কালো মুখোশ পরে ছিল, বন্দুক তুলে আমাদের সবাইকে হাত তুলে দাঁড়াতে বলল। তারপর দু' মিনিটের মধ্যে টাকাফাকা সব নিয়ে বেরুতে যাবে, এর মধ্যে এসে পড়ল পুলিশ, দু'দিক থেকেই গুলি চলতে লাগল, আমি তো ভয়ে একেবারে কাঁটা। ওরা কিন্তু পালিয়ে গেল ঠিকই। ওরা ব্যাঙ্কের একটা মেয়েকে ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে পুলিশকে বলল, গুলি চালানো বন্ধ করো, নইলে মেয়েটা আগে মরবে। পুলিশরা থেমে গেল। ওরা মেয়েটাকে সুদ্ধু একটা গাড়িতে চেপে ভোঁ-ভোঁ।"

সন্তু বলল, "সিনেমায় এরকম দেখা যায়।"

রতন বলল, "ফালাকাটাতে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছিল, সেখানে কিন্তু একজন ডাকাত ধরা পড়ে গেছে।"

মিলিকাকিমা বললেন, "বাবা রে বাবা! থাক, আর ডাকাতের গল্প করতে হবে না।"

গৌতমকাকু বললেন, "ফালাকাটা। অদ্ভুত নাম। আরও কত নাম শুনেছি, গোরুমারা, চাপড়ামারি—"

কাকাবাবু বললেন, "আর একটা জায়গার নাম আরও অদ্ভুত। রাজা-ভাত-খাওয়া!"

গৌতমকাকু বললেন, "বাংলোতে এগুলিকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে না?"

কাকাবাবু বললেন, "কী জানি, আমি অত গ্রামার জানি না। সন্তু বলতে পারবে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তোমার এক নম্বর বাড়ল। গ্রামার নয়, ব্যাকরণ।"

পুরু আপনমনে হেসে উঠল।

মিলিকাকিমা বললেন, "হাসলি কেন রে?"

পুরু বলল, "টোমরা সবাই ইংরাজি বলো। আমি বললেই ডোস?"

মিলিকাকিমা বললেন, "ডোস নয়, দোষ!"

সন্তু বলল, "এই তো একটা তেঁতুল গাছ। গাড়িটা একটু থামান তো। পুরুকে দেখাব।"

রতন গাড়িটা থামিয়ে দিল।

গৌতমকাকু বললেন, "তেঁতুল গাছ আবার দেখবার কী আছে?"

সন্তু বলল, "তেঁতুল কেমন দেখতে হয়, তা পুরু জানে না। এ-গাছটায় অনেক তেঁতুল হয়ে আছে। ওকে একটা কাঁচা তেঁতুল খাইয়ে দিলে ও আর কখনও ভুলবে না।"

মিলিকাকিমা বললেন, "তেঁতুলের টক আমার খুব ফেভারিট। রাস্তার ধারের গাছ। এ গাছ থেকে কয়েকটা তেঁতুল পেড়ে নিলে কেউ কিছু বলবে ?"

গৌতমকাকু বললেন, "ফেভারিট ? ফেভারিট জিনিস খেতে হলে দিতে হবে এক টাকা। সন্তু, লিখে রাখ।"

মিলিকাকিমা বললেন, "বাবা রে বাবা, সবসময় কি মনে থাকে! দেব এক টাকা ফাইন।"

সন্তু বলল, "এক টাকা নয়, দু' টাকা। ফাইন বলেছেন। আমরা বলছি জরিমানা।"

গাছটায় অনেক তেঁতুল ফলে আছে বটে, কিন্তু হাতের নাগাল পাওয়া যায় না। রতন ঢিল ছুড়ে ছুড়ে তেঁতুল পাড়ার চেষ্টা করল।

সন্তু বলল, "ওভাবে হবে না। আমি গাছে উঠতে পারি।"

সন্তু তরতর করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। একটা ডালে দাঁড়িয়ে পটাপট করে তেঁতুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল নীচে।

মিলিকাকিমা বললেন, "সন্তু পড়ে যাবে না তো ? আরও ওপরে উঠছে কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, কেন ? ব্যস, ব্যস, অনেক হয়েছে, এবার নেমে আয় সন্তু।"

সন্তু নেমে এসে পুরুকে বলল, "এই দ্যাখো, তেঁতুল পাতা। খুব ছোট ছোট হয়।"

গৌতমকাকু বললেন, "বাংলায় একটা কথা আছে না, 'যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন।' ভারী সুন্দর কথাটা।"

সন্তু বলল, "তেঁতুল পাতাও খাওয়া যায়, বেশ টক টক লাগে।"

তারপর একটা তেঁতুল ভেঙে আধখানা পুরুকে দিয়ে বলল, "তুমি টক খেতে পারো তো ? চেখে দ্যাখো!"

মিলিকাকিমা খুশিমনে বললেন, "বিনি পয়সায় এত তেঁতুল পাওয়া যায় ? আজ আমি তেঁতুলের টক রান্না করব।"

পুরু তেঁতুলের ভাঙা দিকটায় জিব ছুঁইয়ে বলল, "ভাল খেটে। এটা টেটুল ?"

সন্তু বলল, "টেটুল নয়, তেঁতুল।"

পুরু বলল, "টেনটুল ?"

সন্তু বলল, "উঁহুঁ হল না। টেনটুল নয়, বলো, ত, ত, তেঁতুল!"

পুরু বলল, "ট, ট।"

কাকাবাবু বললেন, "আর দেরি কোরো না, সবাই গাড়িতে ওঠো!"

সন্তু বলল, "একবার যদি ও তেঁতুল বলতে পারে, তা হলে অনেক কিছু শিখে যাবে। তুমিকে টুমি বলবে না। খেতে-কে খেটে বলবে না।"

গাড়ি চলতে শুরু করার পর পুরু বারবার বলতে লাগল, "টেনটুল, টেটুল।" আর তাকে শুধরে দিতে লাগল সন্তু।

॥ ৪ ॥

বড় রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢোকার পর এঁকেবেঁকে অনেকখানি গিয়ে তারপর চোখে পড়ল চাপড়ামারি বনবাংলো। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পড়ন্ত রোদ্দুরে একটু-একটু লালচে দেখাচ্ছে গাছের পাতা। একসঙ্গে অনেক পাখি ডাকছে। ওরা ঘুমোতে যাওয়ার আগে প্রাণভরে ডেকে নেয়।

দূরে শোনা গেল একটা ময়ূরের ডাক।

চৌকিদারকে আগেই খবর দেওয়া ছিল, গাড়ির শব্দ পেয়ে সে এসে গেট খুলে দিল। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস, ছোটখাটো চেহারা, তার নাম যতীন। মুখখানা বেশ হাসিমাখা।

কাঠের বাড়ি। একতলায় খাবার ঘর, বসবার ঘর, সামনে চওড়া বারান্দা। ওপরে দু'খানা শয়নকক্ষ, সেখানেও একটি বড় বারান্দা।

মিলিকাকিমা ওপরে এসে প্রথমেই বাথরুমে উঁকি দিয়ে বললেন, "বাঃ, বেশ পরিষ্কার আছে। বিছানাও সুন্দর।"

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে দোতলায় উঠে বললেন, "তোমার পছন্দ হয়েছে তো মিলি ?"

মিলিকাকিমা বললেন, "খুব সুন্দর। কোনও আওয়াজ নেই। কলকাতায় বড্ড কান ঝালাপালা হয়ে যায়।"

একটা চেয়ার টেনে বসে কাকাবাবু বললেন, "ওহে যতীন, আমাদের আরও একটু চা খাওয়াও।"

যতীন বলল, "চা-চিনি-দুধ এনেছেন তো ? আর চাল-ডাল ? আমি রান্না করে দেব। কিন্তু আমার কাছে ওসব কিছু নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "রণবীর কীসব দিয়ে দিয়েছে, দ্যাখো তো।"

একটা প্যাকেটে রণবীর চা, চিনি, দুধ, পাউরুটি, মাখন, কেক, ডিম এইসব অনেক কিছুই দিয়ে দিয়েছে।

সব দেখে গৌতমকাকু বললেন, "আজ আমরা ডিম-পাউরুটি খেয়ে নেব। কাল সকালে বাজার করে আনব। শুনেছি তো দশ-বারো মাইল দূরেই একটা বাজার আছে। সেখানে সবকিছু পাওয়া যায় ?"

যতীন বলল, "হ্যাঁ স্যার। মাছ পাবেন, মুরগি পাবেন।"

মিলিকাকিমা জিজ্ঞেস করলেন, "কুমড়ো ফুল পাওয়া যায় না ? অনেকদিন কুমড়ো ফুল ভাজা খাইনি।"

যতীন বলল, "তাও এক-একদিন পাওয়া যায়। ফুলকপি, বাঁধাকপি এসব পাবেন।"

গৌতমকাকু বললেন, "না, না, ওসব চাই না। আমেরিকাতে ওসব খেতে খেতে মুখ পচে গেছে। এখানে খুঁজব ভাল পটল, ঝিঙে, কলমিশাক, আর মুরগির বদলে কচি পাঁঠার মাংস!"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কলকাতায় গিয়ে খেয়ো। এখানে যা পাবে তাই-ই খেতে হবে।"

বাংলোর সামনে একটা উঁচুমতন বাঁধ, তার ওপাশে একটা পুকুর। ঠিক গোল বা চৌকো নয়, অনেকখানি ছড়ানো, মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপের মতন। তারপর শুধু জঙ্গল।

মিলিকাকিমা বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওই পুকুরে বুঝি সবাই চান করে ?"

কাকাবাবু বলে উঠলেন, "না, না, না, ওখানে যাওয়াই নিষেধ। তোমরা কেউ এই বাংলোর চৌহদ্দির বাইরে হেঁটে যাবে না। যে-কোনও সময় কোনও জন্তু-জানোয়ার এসে পড়তে পারে। সব সময় গাড়িতে যেতে হবে।"

যতীন বলল, "ওই পুকুরে জন্তু-জানোয়াররা জল খেতে আসে। হাতিরা জলে নেমে অনেকক্ষণ খেলা করে।"

গৌতমকাকু বললেন, "এই বারান্দায় বসেই হাতিদের জলক্রীড়া দেখা যাবে ?"

যতীন বলল, "হ্যাঁ, স্যার, হাতি তো দেখতে পাবেনই, তা ছাড়া বাইসন, লেপার্ড, বুনো শুয়োর, হঠাৎ কখনও-কখনও টাইগারও চলে আসে। ওই দেখুন না, এখনই দুটো পি-কাক দেখা যাচ্ছে।"

গৌতমকাকু বললেন, "পি-কাক ? সেটা আবার কী ধরনের জন্তু ?"

কাকাবাবু বললেন, "ও বলতে চাইছে পিকক, ময়ূর। কোথায় ময়ূর ?"

যতীন বলল, "ওই যে ঝোপটার পাশে।"

সবাই ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এক মিনিট পরেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ময়ূর, মস্ত বড় লেজ, আর কী সুন্দর গায়ের রং।

সন্তু পুরুকে জিজ্ঞেস করল, "দেখতে পেয়েছ ?"

পুরু মাথা নেড়ে বলল, "এই প্রথম আমি বনের ময়ূর ডেকলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, নিখুঁত বাংলা বলছে।"

সন্তু বলল, "প্রঠম নয় প্রথম। ডেকলাম না, দেখলাম।"

যতীন বলল, "পুকুরটার ওপারে দেখুন খানিকটা সাদা পাথরের মতন। ওটা সল্ট লিক।"

কাকাবাবু বললেন, "ওখানে অনেকটা করে নুন দিয়ে আসতে হয় মাঝে-মাঝে। জন্তুরা ওই নুন চাটতে আসে। মানুষের মতন জন্তু-জানোয়ারদেরও নুন খাওয়ার দরকার হয়।"

মিলিকাকিমা বললেন, "এত কাছে জন্তুরা আসে। ওরা এই বাংলোর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে না?"

যতীন অম্লান বদনে বলল, "হ্যাঁ মেমসাহেব, এই পরশুদিনই তো রাত্তিরে একটা লেপার্ড ঢুকে পড়েছিল।"

মিলিকাকিমা বললেন, "আমি মোটেই মেমসাহেব নই। আমাকে দিদি কিংবা বউদি বলবে। তা লেপার্ডটা ঢুকে পড়ার পর কী করল?"

যতীন অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "কী আর করবে কিছুক্ষণ হাউ হাউ করে ডেকে চলে গেল। ও আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশিরভাগ জন্তুই সন্ধের পর বেরোয়। তখন এখানে দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখতে হয়। তা হলে তো ওরা আর কিছু করতে পারে না। ঘুরেটুরে চলে যায়। একমাত্র ভয় হাতির পালকে। ওরা ঘর-বাড়ি ভেঙে দিতে পারে।"

মিলিকাকিমা বললেন, "ওরে বাবা, তা হলে যদি হাতি এসে পড়ে?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "ভাল করে দেখো, এই বাংলোর চার পাশে একটা পরিখা কাটা আছে।"

মিলিকাকিমা বললেন, "পরিখা কী?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকটা সরু খালের মতন। হাতি আর সব পারে, শুধু লাফাতে পারে না অত বড় শরীর নিয়ে। তাই হাতি ভেতরে আসতে পারে না।"

যতীন বলল, "গেটের কাছেও কাঠের পাটাতন। রাত্তিরবেলা ওটা কপিকল দিয়ে টেনে তোলা যায়। ওখান দিয়েও হাতি ঢুকতে পারে না।"

পুরু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওই দ্যাকো, ওই দ্যাকো, কতকগুলো বাফেলো।"

সন্তু বলল, "বাফেলো নয়, বাইসন। বাফেলোর বাংলা মোষ। কিন্তু বাইসনের বাংলা নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "মোষের মতন দেখতে হলেও বাইসন আলাদা। লক্ষ করে দেখো, ওদের পায়ের তলাটা সাদা, ঠিক যেন সাদা মোজা পরে আছে। ওরা খুবই হিংস্র প্রাণী। দল বেঁধে থাকলে বাঘও ভয় পায়। ধারালো শিং দিয়ে পেট ফুটো করে দেয়।"

সন্তু বলল, "এক, দুই...মোট সাতটা।"

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে বাইসন দেখতে লাগল। সন্তু আগে অনেক জঙ্গলে গেছে, কিন্তু পুরুর কাছে এসবই প্রথম, সবই নতুন।

সন্তু ভাবল, "ইস, জোজো এবার এল না। জোজো থাকলে এতক্ষণে কত মজার মজার কথা বলত।"

সন্ধে হতে-না-হতেই খুব তাড়াতাড়ি ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। জঙ্গলের মতন এমন গাঢ় অন্ধকার শহরে দেখা যায় না। রাত্তির হলেই জঙ্গল রহস্যময় মনে হয়। কোনও শব্দ নেই, তবু যে-কোনও দিকে তাকালেই মনে হয় যেন কোনও হিংস্র জানোয়ার সেখানে লুকিয়ে আছে। মাঝে-মাঝে জোনাকি দেখা যাচ্ছে। সবগুলোই জোনাকি না কোনও পশুর চোখ, তা বোঝার উপায় নেই। সব পশুর চোখই রাত্তিরে জ্বলজ্বল করে।

বারান্দা ছেড়ে কেউ আর ঘরে গেল না। রাত্তিরের খাওয়াদাওয়াও হল ওখানে বসে। মাঝে-মাঝে জঙ্গলে নানারকম শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুটো বড়-বড় সার্চলাইট রয়েছে। সেগুলো জ্বাললে শুধু বাইসনদেরই দেখা যাচ্ছে, ওরা জায়গা ছেড়ে নড়ছে না।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে যেন তাণ্ডব শুরু হল। গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে হাজির হল একপাল হাতি। তারা হুড়মুড় করে নেমে গেল জলে। সার্চলাইটে স্পষ্ট দেখা গেল, ছ'টা বড় হাতি আর দুটো বাচ্চা। তারা শুঁড়ে করে জল ছেটাচ্ছে এ ওর গায়ে। যেন খেলা করছে।

হাতিরা আসার পর বাইসনগুলো সরে গেছে। কিন্তু দুটো হরিণ একটু দূরে এসে জল খেতে লাগল।

গৌতমকাকু বললেন, "সত্যি, এরকম দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। রাজা, ভাগ্যিস তুমি আমাদের এখানে নিয়ে এলে! আমাদের বাংলায় যে এরকম জঙ্গল আছে জানতুমই না। তোর কেমন লাগছে রে পুরু ?"

পুরু বলল, "ফ্যানটাসটিক! মানে, সমৎকার!"

সন্তু বলল, "এক নম্বর। আর সমৎকার নয়, চমৎকার!"

মিলিকাকিমা বললেন, "যাই বলো, আমার একটু ভয় ভয় লাগছে।"

গৌতমকাকু বললেন, "চলো, বাংলোর বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়াই, তা হলে তোমার ভয় ভেঙে যাবে।"

মিলিকাকিমা বললেন, "মাথা খারাপ!"

পুরু বলল, "মাতা কারাপ না, মাতা বালো!"

এই সময় যেন খুব কাছেই শোনা গেল বাঘের গর্জন!

মিলিকাকিমা কেঁপে উঠে বললেন, "ওরে বাবা রে! ওরে বাবা রে!"

॥ ৫ ॥

সবারই ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে।

রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত জেগে দেখা হয়েছে জঙ্গলের রাত্রির দৃশ্য। বাঘটার ডাকই শোনা গেছে কয়েকবার। কিন্তু সার্চলাইট ফেলেও সেটাকে দেখা যায়নি।

কাকাবাবুর অবশ্য ধারণা, বাঘ একটা নয়, দুটো। ওরা হাতির পাল দেখে রেগে রেগে ডাকছিল। হাতিদের জন্যই জল খেতে আসতে পারছিল না। হাতি আর বাঘ কাছাকাছি থাকে না। হাতিরা অবশ্য বাঘের গর্জন গ্রাহ্যও করেনি। অনেকক্ষণ খেলা করেছে জলে।

সকালবেলা শুধু শোনা যাচ্ছে অসংখ্য পাখির ডাক। কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে, কিছু পাখি পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে থাকে।

চা খাওয়ার পরই গৌতমকাকু সন্তু আর পুরুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে চলে গেছেন বাজার করে আনতে।

কাকাবাবু একটা ইজিচেয়ারে বসে বই খুলে পড়তে লাগলেন।

মিলিকাকিমা স্নানটান সেরে এসে বললেন, "আপনার বন্ধু এই যে বাজারে গেল, কখন আসবে তার ঠিক নেই। দেখবেন, ও রাজ্যের জিনিস কিনে আনবে, সব খাওয়াই হবে না, ফেলে দিতে হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে বাজারে গেলে ওর সবকিছুই খুব সস্তা মনে হয়, তাই না! ডলারের সঙ্গে তুলনা করলে সস্তাই তো বটে!"

মিলিকাকিমা বললেন, "এখানে একজোড়া ডিম মোটে পাঁচ টাকা, আমরা ওখানে ভাবতেই পারি না। আমাদের হিসেবে নব্বই-একশো টাকা তো হবেই!"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু সস্তা নয়। সবকিছুই টাটকা। অবশ্য পাঁচটা টাকাও এখানকার অনেক লোকের কাছে বেশি। কত গরিব লোক ডিম খেতেই পায় না।"

মিলিকাকিমা বারান্দার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "হুঁঃ। মাঝে-মাঝে আমার এত কষ্ট হয়। আমরা যারা বিদেশে থাকি, আমাদের সবার উচিত প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু টাকা এদেশের গরিবদের জন্য পাঠানো।"

তারপর বললেন, "কাল রাত্রে কি গন্ডার এসেছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। গন্ডার চট করে দেখা যায় না।"

"এদেশে গন্ডার নেই ?"

"থাকবে না কেন ? আসামে অনেক গন্ডার আছে। পশ্চিম বাংলাতেও আছে। এখানে জঙ্গলগুলো তো ভাগ ভাগ করা। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যেও বেশ কিছু গন্ডার আছে, কিন্তু তারা বিশেষ অন্য জঙ্গলে আসে না, হঠাৎ দু'-একটা ছিটকে চলে আসতে পারে।"

"আমি কখনও গন্ডার দেখিনি।"

"চিড়িয়াখানাতেও দ্যাখোনি ? কলকাতার চিড়িয়াখানায় আছে।"

"না, কলকাতার চিড়িয়াখানায় আবার গেলাম কবে ? শুধু সিনেমায় দেখেছি।"

"ঠিক আছে, আমরা গন্ডার দেখতে যাব। হলং গেলে দেখা যেতে পারে। অবশ্য যদি তোমার ভাগ্যে থাকে।"

গৌতমকাকু ফিরে এলেন প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে।

সত্যি তিনি গাড়িভর্তি করে যেন গোটা বাজারটাই তুলে এনেছেন। নানারকমের তরকারি। শাক-সব্জি, মাছ, মাংস, মুরগি। এতসব সাতদিনেও খেয়ে শেষ করা যাবে না। ওঁদের এখানে থাকার কথা মাত্র তিনদিন।

এর পর মিলিকাকিমা আর গৌতমকাকু যতীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রান্নায় মেতে উঠলেন। ড্রাইভার রতনেরও এ-ব্যাপারে খুব উৎসাহ আছে।

সন্তু অবিরাম চেষ্টা করে যেতে লাগল পুরুকে বাংলা শেখাতে।

পুরু এখন গাস-এর বদলে গাছ বলতে পারছে। দেকতে নয়, দেখতে। মাতা নয়, মাথা। বালো নয়, ভাল।

কিন্তু তেঁতুল বলতে পারছে না কিছুতেই।

টেন্‌টুল আর টেটুল বলতে বলতে একবার সে বলে ফেলল, "টেনতুল!"

সন্তু বলল, "বা, এই তো অনেকটা হয়েছে। টেন নয়, বলো তেঁ, তেঁ, তেঁ।"

পুরু বলল, "টেন, টেন, টেন।"

সন্তু বলল, "ভাল করে শোনো। টেন নয়, এর মধ্যে ন নেই, চন্দ্র বিন্দু। আর ট-এর বদলে ত। ত তো আবার বললে! বলো, ত, ত, ত।"

পুরু বলল, "ত, ত, ত। তেনতুল!"

সন্তু বলল, "আবার ন বলছ! শুধু বলো তেঁতুল।"

পুরু বলল, "তেতুল।"

কাকাবাবু বই থেকে মুখ তুলে বললেন, "ওই তো হয়েছে। তেতুল পর্যন্ত বলেছে। চন্দ্রবিন্দুটা পরে হবে। ত বলতে পেরেছে তো!"

সন্তু বলল, "তা হলে এখন তুমি, তোমাকে, তালগাছ, তখন, তারপর, তুলতুলে, তপন, তাড়াতাড়ি, এইসবই পারবে।"

পুরু চেষ্টা করে ঠিকঠাকই বলে যেতে লাগল, শুধু একবার বলে ফেলল, টালগাছ। আর তপনকে কিছুতেই টপন ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারে না। তার এক মামাতো ভাইয়ের নাম তপন, তাকে টপন বলাটাই অভ্যেস হয়ে গেছে।

সব রান্না শেষ হলে খেতে খেতে বেলা সাড়ে তিনটে বেজে গেল।

মিলিকাকিমা মনের সাধ মিটিয়ে কাঁচা তেঁতুলের টক রান্না করেছেন।

তাতে এক চুমুক দিয়ে পুরু বলল, "মা, আমি তেতুল বলতে পারি!"

মিলিকাকিমা বললেন, "তোর বাবা যে বাঙাল, তাই তুই তেতুল পর্যন্ত পেরেছিস। চন্দ্রবিন্দু আর হবে না!"

গৌতমকাকু বললেন, "নিশ্চয়ই পারবে। আমি তো পারি। তেঁতুল! বল, তেঁতুল!"

এবারে পুরু বলল, "তেঁতুল!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, এ তো দারুণ ইমপ্রুভমেন্ট! একবেলার মধ্যে..."

সন্তু গম্ভীরভাবে মাস্টারমশাইয়ের মতন বলল, "কাকাবাবু, তোমার এক নম্বর। আর পুরু, তুমি তেঁতুল ঠিক বললে, কিন্তু আবার বলটে হয়ে গেল কেন? বলতে বলতে পারো না?"

একটু পরেই বিকেল হয়ে যাবে, আজ আর বেরোনো হল না।

সন্ধে হতে-না-হতেই আবার দেখা গেল হাতির পাল। অনেক হরিণ। বারবার শোনা গেল ময়ূরের ডাক।

আজও দু'বার শোনা গেল বাঘের গর্জন।

পরদিন সকালে কাকাবাবু সবাইকে বললেন, "তোমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, আজ জলদাপাড়া যাব। মিলিকে গন্ডার দেখাতে হবে।"

পুরু জিজ্ঞেস করল, "গন্ডার কী?"

সন্তু বলল, "তোমাকে ইংরেজি নামটা বলব না। তা হলেই আমার এক পয়েন্ট হয়ে যাবে। সেটা এমন একটা প্রাণী, মোষের চেয়ে একটু বড়, হাতির থেকে ছোট, আর গায়ের চামড়া খুব পুরু।"

কাকাবাবু বললেন, "গন্ডারকে আজ যদি কাতুকুতু দাও, সাতদিন পরে হাসবে।"

সবাই হেসে উঠল, শুধু অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইল পুরু। সে বেচারি কাতুকুতু মানেও জানে না।"

গৌতমকাকু বললেন, "বুঝলি না তো! জন্তুটাকে যদি দেখতে পাস, তা হলে ঠিক চিনতে পারবি!"

সবাই মিলে গাড়িতে ওঠার পর হলং বাংলোতে পৌঁছতে ঘন্টা দুয়েক লেগে গেল। এখানকার গেট দিয়ে ঢোকার ব্যাপারে কড়াকড়ি আছে, কিন্তু কাকাবাবুর নাম শুনে ছেড়ে দিল। ডি এম সাহেব ফোন করে জানিয়ে রেখেছিলেন।

ভেতরে আসার পর এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে কাকাবাবুকে বললেন, "আমি এখানকার ফরেস্ট রেঞ্জার, আমার নাম আমজাদ আলি। আপনিই তো কাকাবাবু? ডি এম সাহেব আপনাদের কথা বলেছেন। আমি কালকেও আপনাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কাল আর আসা হয়নি।"

আমজাদ আলি বললেন, "আপনাদের জন্য দুটো ঘরের ব্যবস্থা করা আছে। আজ রাত্তিরে এখানে থাকবেন তো?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমাদের সব জিনিসপত্র চাপড়ামারিতে আছে। আমরা এখানকার জঙ্গলটা একটু ঘুরে দেখে যেতে চাই। আলিসাহেব, গন্ডার দেখা যেতে পারে কি?"

আমজাদ আলি বললেন, "গন্ডার দেখতে হয় ভোরবেলা হাতির পিঠে চেপে। দুপুরবেলা তো জঙ্গলে ঢোকার নিয়ম নেই। তা আপনাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা যেতেই পারে। সবাই হাতির পিঠে চাপবেন তো?"

গৌতমকাকু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল হবে।"

পুরুর দিকে ফিরে বললেন, "আমরা এলিফ্যান্ট রাইড নেব, বুঝলি। দারুণ থ্রিলিং হবে।"

সন্তু বলল, "গৌতমকাকু, আপনার দুই!"

মিলিকাকিমা বললেন, "আমি বাপু হাতির পিঠে চাপতে পারব না। আমার ভয় করবে!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, মিলি আর আমি গাড়িতেই যাব। একটা হাতির পিঠে সবাই মিলে চাপাও যাবে না।"

আমজাদ আলি বললেন, "দুটো হাতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে, আপনারা উঠতে না চাইলে জিপগাড়িতে যেতে পারেন, আপনাদের গাড়ি ভেতরের রাস্তায় চলতে পারবে না।"

গৌতমকাকুর সঙ্গে সন্তু আর পুরু চাপল হাতির পিঠে। আমজাদ আলির নিজস্ব জিপে উঠলেন কাকাবাবু আর মিলিকাকিমা।

জঙ্গলের মধ্যে খুবই এবড়োখেবড়ো রাস্তা। জিপগাড়িটা চলছে লাফিয়ে লাফিয়ে। হাতির কোনও অসুবিধে নেই, সে চলেছে দুলকি চালে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আলিসাহেব, আপনার বাড়ি কোথায় ?"

আমজাদ আলি বললেন, "আমাকে স্যার তুমি বলবেন। সাহেবটাহেব কিছু নয়, শুধু আমজাদ। আমার বাড়ি মালদায়। এখানে আছি অনেকদিন। জঙ্গল আমার ভাল লাগে। তবে, এবারে ট্রান্সফার নেওয়ার চেষ্টা করছি।"

"কেন ?"

"আগে এ-অঞ্চলটা খুবই ভাল ছিল। খুব শান্তিপূর্ণ। কিন্তু এখন সময় খুব খারাপ হয়ে গেছে। কয়েকদিন আগেই আমার একজন ফরেস্ট গার্ড মারা পড়েছে।"

"কোনও জানোয়ারের হাতে মারা পড়ল ?"

"না, স্যার। আমাদের ট্রেনিং নেওয়া আছে। জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে কী করে বাঁচতে হয়, তা আমরা জানি। ফরেস্ট গার্ডকে ওরা গুলি করে মেরেছে।"

"ওরা মানে কারা ?"

"সবার পরিচয় কী আর জানি! নানারকম অপরাধীরা এই জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা তো খুব সহজ। বাইরের লোক আসতে পারে না। পুলিশও আসে না। শুধু আমরা কয়েকজন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক। আমাদের কাছে তো তেমন অস্ত্রশস্ত্র নেই। ওদের কাছে অতি আধুনিক মারাত্মক সব অস্ত্র আছে। যখন-তখন আমাদের মুখোমুখি হলেই মেরে দেয়।"

মিলিকাকিমা বললেন, "বাবা রে বাবা, জঙ্গলের মধ্যেও শান্তি নেই ?"

আমজাদ আলি বললেন, "দিদি মানুষের মতন হিংস্র জন্তু কি আর আছে ? এই জঙ্গলে হাতি, বাঘ, গন্ডার আছে বটে, কিন্তু গত তিন বছরের মধ্যে আমাদের একজন লোকও কোনও জানোয়ারের আক্রমণে মরেনি। কিন্তু মানুষের হাতে মরেছে তিনজন। বিনা দোষে। শুধু তাদের দেখে ফেলাটাই অপরাধ।"

মিলিকাকিমা বললেন, "এই রে, এখন যদি আমরা ওদের কারুকে দেখে ফেলি ?"

আমজাদ আলি বললেন, "আমরা খুব গভীর জঙ্গলে যাব না। তা ছাড়া দিনের বেলা ওরা লুকিয়ে থাকে।"

মিলিকাকিমা বললেন, "কাজ নেই বাপু গন্ডার দেখে। চলুন, আমরা ফিরে যাই।"

আমজাদ আলি বললেন, "ওই দেখুন, একপাল শম্বর!"

মিলিকাকিমা কই কই বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে, তারপর দেখতে পেয়ে বললেন, "বাঃ, ভারী সুন্দর তো। বড় বড় হরিণকে বুঝি শম্বর বলে ?"

আমজাদ আলি বললেন, "এখানে নানারকম হরিণ দেখতে পাবেন। হরিণ প্রচুর বেড়েছে। আমরা এই জঙ্গলটার খুব যত্ন করে জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়েছি, কিন্তু মানুষের হিংস্রতার জন্য সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!"

কাকাবাবু বললেন, "এইসব সংরক্ষিত অরণ্যে নানা ধরনের অপরাধীদের লুকিয়ে থাকা সহজ। সরকার কি তা বোঝে না ? সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয় না ?"

আমজাদ আলি মুখখানা মলিন করে বললেন, "সে আমি কী করে বলব বলুন। আমি এখন এখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচি।"

আরও পাল পাল হরিণ দেখা যাচ্ছে। নানান জাতের হরিণ।

হাতির ওপর বসে গৌতমকাকু বললেন, "কই হে, এ জঙ্গলে কি হরিণ ছাড়া আর কিছু নেই ? ওহে মাহুত, এখানে বাঘ নেই ?"

মাহুত বলল, "হ্যায় হুজুর।"

গৌতমকাকু বললেন, "বাইসন, হাতিও তো দেখা যাচ্ছে না।"

মাহুত বলল, "কাল সুবে সুবে আসবেন। তখন বহুৎ কিছু দেখতে পাবেন।"

গৌতমকাকু একদিকে হাত দেখিয়ে বললেন, "ওই যে একটা ময়ূর। যাক, তবু একটা ময়ূর দেখা গেল।"

পুরু অন্যদিকে হাত দেখিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল, "রাইনো, রাইনো!"

সত্যি, ডান দিকের একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো গন্ডার। পাশাপাশি। দেখে মনে হয়, এক্ষুনি দৌড় শুরু করবে।

গৌতমকাকু ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগলেন।

সন্তু পুরুকে বলল, "এবার তো বুঝলে গন্ডার কাকে বলে ?"

পুরু বলল, "হ্যাঁ, রাইনো। বাবা যে বলছিল। কাটাকুটু দেবে, তার মানে কী ?"

সন্তু বলল, "কাটাকুটু নয়, কাতুকুতু! ঠিকমতন তুমি যদি উচ্চারণ করতে পারো, তা হলে মানে বলে দেব ?"

পুরু বলল, "কাতাকুতু ? কাতুকুতু ?"

সন্তু বলল, "এবার ঠিক হয়েছে।"

তারপরই সে পুরুর বগলের তলায় হাত দিয়ে কাতুকুতু দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ছটফট করে উঠল পুরু। সরে গেল দূরে।

সন্তু বলল, "এই হচ্ছে কাতুকুতু!"

পুরু জিজ্ঞেস করল, "গন্ডার সাতদিন পরে হাসে কেন ?"

সন্তু বলল, "গন্ডারের চামড়া এতই পুরু যে, সুড়সুড়িটা ভেতরে পৌঁছতে অনেক সময় লাগে।"

পুরু জিজ্ঞেস করল, "সুড়সুড়ি মানে ?"

গৌতমকাকু বললেন, "থাক, যথেষ্ট হয়েছে আজকের মতন। ওই দ্যাখ গন্ডার দুটো দৌড়চ্ছে। এসব তো আর দেখতে পাবি না। বাংলা পরে শিখলেও চলবে।"

গন্ডারদুটো দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা যে হাতিটায় চেপেছে, সেটা হঠাৎ শুঁড় তুলে ডেকে উঠল।

মাহুত বলল, "শের হ্যায়। বাঘ দেখলে হাতি রাগ করে।"

সবাই ব্যগ্রভাবে বাঘ দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটাকে দেখা গেল না।

এর পর আর অনেকক্ষণ হরিণের দৌড়নো ছাড়া আর দেখা গেল না কিছুই।

কাকাবাবুর নির্দেশে সবাই ফিরে এল হলং বাংলোয়।

আমজাদ আলি ওঁদের না খাইয়ে ছাড়লেন না। খাওয়া শেষ করতে করতে গড়িয়ে গেল দুপুর।

কাকাবাবু বললেন, "এবার আমাদের রওনা হওয়া উচিত। সন্ধের আগে চাপড়ামারি পৌঁছলে ভাল হয়।"

আমজাদ আলি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, সন্ধে হয়ে গেলে আর বাংলো থেকে বেরোবেন না। দিনকাল ভাল নয়।"

তখনই হলং ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেও চাপড়ামারি পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গেল। রাস্তায় একটা ট্রাকের সঙ্গে একটা জিপগাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তাই দারুণ জ্যাম।

এর মধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছে। বাংলোয় পৌঁছেই কাকাবাবু বললেন, "যতীন কোথায়, চা বানাও, চা বানাও, বিকেলের চা খাওয়া হয়নি।"

গৌতমকাকু বললেন, "জ্যামের জন্য যখন গাড়ি থেমে ছিল, তখন দেখি যে রাস্তার পাশে একটা দোকানে শিঙাড়া ভাজছে। গরম গরম শিঙাড়া কিনে এনেছি, চায়ের সঙ্গে জমবে!"

মিলিকাকিমা বললেন, "বাবা রে বাবা, শিঙাড়া দেখলে তুমি আর লোভ সামলাতে পারো না। যখন পেট খারাপ হবে, তখন বুঝবে।"

গৌতমকাকু বললেন, "এখানকার জল খুব ভাল। আমি পাথর খেয়েও হজম করতে পারব!"

দোতলার বারান্দায় বসে সবেমাত্র চা পান শুরু হয়েছে, তখনই একটা জিপগাড়ি এসে থামল গেটের বাইরে। তার থেকে ঝপাঝপ করে নেমে পড়ল তিনজন পুলিশ।

কাকাবাবু উঁকি দিয়ে দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, "আবার পুলিশ কেন ? ওদের আসতে বারণ করে দিলাম।"

পুলিশ তিনজন গটগট করে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে। তাদের একজনের হাতে একটা স্টেনগান।

তাদের মধ্যে একজন সামনে এগিয়ে এসে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "মিস্টার রায়চৌধুরী, চা খাচ্ছেন ? ঠিক আছে, শেষ করে নিন।"

কাকাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার ?"

পুলিশটি বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "যেতে হবে মানে ? কোথায় যাব ? আপনাদের কে পাঠিয়েছে ?"

লোকটি হাসিমুখে বলল, "কেউ পাঠায়নি। আমি নিজেই এসেছি।"

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে গেলেন, এরা আসল পুলিশ নয়। তিনি হাতের চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখতেই সেই লোকটি বলল, "আমি জানি, আপনার সঙ্গে একটা রিভলভার থাকে। সেটা বার করার চেষ্টা করবেন না। আপনি দু'হাত ওপরে তুলে থাকুন।"

গৌতমকাকু কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, "পুলিশের লোক এরকম ব্যবহার করছে কেন ? আপনারা রাজা রায়চৌধুরীকে চেনেন না ? এখানকার ডি এম সাহেবের উনি কাকা হন।"

সেই লোকটি এক ধমক দিয়ে বলল, "শাট আপ! আর কেউ একটাও কথা বলবে না। আমি অকারণ রক্তারক্তি পছন্দ করি না।"

সে এগিয়ে এসে কাকাবাবুর গা চাপড়ে কোটের ভেতরের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে নিয়ে নিজের কোমরে গুঁজল।

তারপর বলল, "এঁকে চিনব না কেন ? রাজা রায়চৌধুরী কাকাবাবু নামেই বেশি বিখ্যাত। বিখ্যাত বলেই তো এঁকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার নাম শঙ্কর রায়বর্মন। আমিও কম বিখ্যাত নই। এ-তল্লাটে অনেকেই আমার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে। নিন, চটপট চা-টা শেষ করে নিন।"

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, "আপনার নাম আমি শুনেছি। আরও চা আছে। আপনি চা খাবেন ?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "না, আমি চা খাব না। তবে একটা শিঙাড়া খেতে পারি।"

গৌতমকাকু বললেন, "এরা আসল পুলিশ নয় বুঝি ?"

সন্তু মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "শঙ্কর রায়বর্মন, আপনি যে উদ্দেশ্যে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছেন, তা সফল হবে না।"

শঙ্কর রায়বর্মন হেসে বলল, "আমি কী উদ্দেশ্যে এসেছি, তা আপনি এর মধ্যেই বুঝে গেছেন ? তা পারবেন না কেন, আপনি বুদ্ধিমান লোক। আপনার মাথার দাম আমি ঠিক করেছি, কুড়ি লক্ষ টাকা। সেই টাকাটা পেলেই আপনাকে ছেড়ে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "এর আগেও কয়েকবার আমাকে এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে। কোনওবারই কেউ শেষপর্যন্ত আমাকে ধরে রাখতে পারেনি। টাকাও পায়নি।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আপনার অনেক অভিযানের কাহিনী আমি পড়েছি। যারা আগে কয়েকবার আপনাকে আটকে রেখেছিল, তারা সব বোকা! আমার হাত থেকে আপনি কিছুতেই পালাতে পারবেন না। পুলিশ আমার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। এই আমার চ্যালেঞ্জ রইল।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু আমার জন্য কুড়ি লক্ষ টাকা কে দেবে ? আমার অত টাকা নেই, আমার দাদাও অত টাকা দিতে পারবেন না।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আপনাদের তো কলকাতায় একটা বাড়ি আছে, সেটা বিক্রি করে দেবেন। কিংবা, এরা ফিরে গিয়ে আর যে-কোনওভাবে হোক, টাকার জোগাড় করুক।"

কাকাবাবু বললেন, "টাকা দিতে না পারলে কী হবে?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "দেবে, দেবে, ঠিকই দেবে। আর বেশি ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করলে—"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে মেরে ফেলবেন, এই তো!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "না, না, সোনার হাঁসকে কি কেউ প্রথমেই মারে? দরকার হলে একটু একটু করে, যেমন ধরুন, প্রথমে আপনার ডান হাতের পাঞ্জাটা কেটে আপনার দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "ওরে বাবা, প্রথমেই ডান হাত? তা হলে আর রইলটা কী? সেই যে গান আছে, মুণ্ডু গেলে খাবোটা কী?"

শঙ্কর রায়বর্মন এবার হিংস্র মুখ করে বলল, "আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন? আমাকে এখনও চেনেন না।"

সে কাকাবাবুর গালে ঠাস করে এক চড় কষাল।

গৌতমকাকু আঁতকে উঠে বললেন, "এই, এই ওর গায়ে হাত তুলছ!"

শঙ্কর রায়বর্মন ওঁর দিকে ফিরে বলল, "আপনি কে? আপনার নামটা শুনি? আপনার পরিচয় কী?"

গৌতমকাকু বললেন, "আমার নাম ডাক্তার গৌতম হালদার, আমি এখানে থাকি না। আমেরিকায়..."

কাকাবাবু ওঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "এই গৌতম—"

ততক্ষণে গৌতমকাকু বলে ফেলেছেন, "আমেরিকায় আছি বহু বছর..."

শঙ্কর রায়বর্মন শিস দিয়ে বলল, "আপনি আমেরিকায় থাকেন, ডাক্তার? দেন ইউ আর এ বিগার ফিশ। আপনাকেই বা ছাড়ি কেন? আপনার মাথার দাম অন্তত পঞ্চাশ লাখ তো হবেই। আপনাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। এই জটা, এর হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেল।"

ওর একজন সঙ্গী এল গৌতমকাকুর হাত বাঁধতে।

কাকাবাবু বললেন, "ওকে নিলে কিন্তু আপনার বিপদ হবে। আমার জন্য কেউ মাথা ঘামাবে না। আমি মরি কি বাঁচি, তাতে কারও কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমার এই বন্ধু আমেরিকার নাগরিক। ওকে ধরে রাখলে আমেরিকার সরকার এ-দেশের সরকারকে চাপ দেবে।"

শঙ্কর রায়বর্মন অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "ওসব আমেরিকা ফ্যামেরিকা আমাকে দেখাবেন না। আমি গ্রাহ্য করি না। কী করে টাকা আদায় করতে হয়, আমি জানি।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা কিন্তু তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছ!"

শঙ্কর রায়বর্মন হুঙ্কার দিয়ে বলল, "তুমি? আমাকে তুমি বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?"

আবার সে কাকাবাবুর গালে একটা চড় কষাল।

সন্তু এবার ছেলেমানুষের মতন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "কাকাবাবুকে মারছে! কাকাবাবুকে মারছে!"

শঙ্কর রায়বর্মন সন্তুকে পা দিয়ে এক ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই ছোঁড়া, চুপ কর! এতবড় ধেড়ে ছেলে, কাঁদছে দ্যাখ!"

সেই পায়ের ধাক্কায় সন্তু গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে সে একজন নকল পুলিশের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। সেই লোকটার হাতেই স্টেনগান।

সে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতেই সন্তু তার হাত থেকে স্টেনগানটা ছিনিয়ে নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

গম্ভীর গলায় বলল, "এবারে তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যান। এদিক-ওদিক করলেই আমি গুলি চালাব। শঙ্কর রায়বর্মন, আপনার হাতের রিভলভারটা টেবিলের ওপর রাখুন।"

শঙ্কর রায়বর্মন কাকাবাবুর সামনে থেকে নড়ল না।

সন্তুর দিকে চেয়ে বলল, "এ ছোঁড়ার এলেম আছে তো দেখছি! এর নাম সন্তু, তাই না? ওর কথা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। তা তুই কী করবি? কী করে ওটা চালাতে হয় জানিস?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু কিন্তু সবরকম ফায়ার আর্মস চালাতে জানে।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "তাই নাকি? মানুষ মারার অভ্যেসও আছে, দেখি কেমন পারিস?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রাণে না মারলেও ও পায়ে গুলি চালাবে।"

শঙ্কর রায়বর্মন সিনেমার ভিলেনের মতন হা-হা করে হেসে উঠল।

তারপর বলল, "ফক্কা! ফক্কা! ওটার মধ্যে গুলি নেই। আর্মির কাছ থেকে দুটো এ কে ফরটি সেভেন কেড়ে নিয়েছি, কিন্তু গুলি পাইনি। তবে, শুধু ওগুলো দেখলেই সবাই ভয় পেয়ে যায়। গুলির অর্ডার দিয়েছি, এসে যাবে।"

তার হাতে কাকাবাবুর রিভলভার। নিজের কোমর থেকে আর একটা রিভলভার বার করে বলল, "এই দুটোতে কিন্তু গুলি আছে। মানুষ মারতে আমার একটুও হাত কাঁপে না। এই ছোঁড়া, তুই অস্তরটা ফেরত দিবি, না গুলি খেতে চাস।"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা ফেরত দে, সন্তু!"

সন্তু সেটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল।

শঙ্কর রায়বর্মন তার কাছে গিয়ে প্রথমে কাঁধ চাপড়ে বলল, "গুড অ্যাটেম্‌প্ট মাই বয়!"

তারপর সন্তুকেও সে একখানা থাপ্পড় মারল খুব জোরে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ফের যদি পাকামি করিস, তোর কাকাবাবুর মতন তুইও খোঁড়া হবি! এটা ছেলেখেলা নয়, যুদ্ধ। আমি যুদ্ধ ঘোষণা করেছি! আমি এখানকার রাজা!"

কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "আর দেরি নয়, রাজা রায়চৌধুরী, উঠে পড়ো। ক্রাচ বগলে নাও। তোমার এই আমেরিকান ডাক্তার বন্ধুটিও আমাদের সঙ্গে যাবে।"

মিলিকাকিমা এতক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার তিনি বলে উঠলেন, "ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমিও সঙ্গে যাব।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "না, না, আমরা মহিলাদের গায়ে হাত ছোঁয়াই না। আপনারা কলকাতায় ফিরে যান, টাকার জোগাড় করুন গিয়ে। ছোট ছেলেদেরও আমরা ধরে রাখি না।"

মিলিকাকিমা ছুটে এসে তাঁর স্বামীকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি কিছুতেই ওঁকে একা যেতে দেব না!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "এইমাত্র বললাম, আমরা মেয়েদের গায়ে হাত দিই না। কিন্তু আপনি এরকম করলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে বাধ্য হব। শেষ পর্যন্ত দরকার হলে গুলিও চালাব। কোনও লাভ নেই, সরে যান। ও ডাক্তারমশাই, আপনার বউকে সরে যেতে বলুন।"

গৌতমকাকু বললেন, "মিলি সরে যাও।"

মিলিকাকিমা বললেন, "না, আমি কিছুতেই তোমাকে এই বিপদের মুখে যেতে দেব না!"

শঙ্কর রায়বর্মন মিলিকাকিমাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য হাত তুলতেই পুরু দৌড়ে এসে বলল, "ডোন্ট টাচ মাই মাদার!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "দেন আস্ক ইয়োর মাদার টু স্টেপ অ্যাসাইড।"

তারপর সে মিলিকাকিমাকে বলল, "শুনুন, আপনার স্বামীর কোনও বিপদ হবে না। ভালই খাওয়াদাওয়া আর শোয়ার জায়গা দেব। দশদিন সময়। এর মধ্যে টাকাটা জোগাড়

করুন। টাকা পেলেই সুস্থভাবে ফিরিয়ে দেব। টাকা না পেলে অবশ্য একটা-একটা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফেরত যাবে।"

মিলিকাকিমা বললেন, "আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনি লেখাপড়া জানেন। আপনি এরকম নিষ্ঠুরের মতন কথা বলছেন— ?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "লেখাপড়া জানলেই কি নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে হবে ? আমি যে-কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, তার জন্য আমার অনেক টাকার দরকার। টাকার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। আমেরিকায় থাকেন। পঞ্চাশ লাখ টাকা আর আপনাদের কাছে এমন কী ব্যাপার! এক কোটি, দু'কোটি তো চাইনি! তাও চাইতে পারতাম!"

এর পর সে কাকাবাবুর গায়ে রিভলভারের খোঁচা দিয়ে বলল, "আর দেরি নয়!"

কাকাবাবু আর গৌতমবাবুকে নিয়ে ওরা নীচে নেমে গেল। তার পরেই তাঁদের তুলে নিয়ে জিপগাড়িটা মিলিয়ে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে।

মিলিকাকিমা ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, "ধরে নিয়ে গেল ? সত্যিই ধরে নিয়ে গেল ? অ্যাঁ! এখন কী হবে ?"

পুরু বলল, "কিডন্যাপিং! অ্যাবডাকশান! উই মাস্ট ইনফর্ম দা পুলিশ রাইট নাও! হোয়ার দা হেল উই দেন ফাইন্ড আ টেলিফোন, সন্তু ?"

তার এখন একটাও বাংলা কথা মনে পড়ছে না।

॥ ৬ ॥

বিয়েবাড়ির উৎসবের মধ্যেও জোজোর একেবারে মন টিকছে না।

একটা মস্ত বড় বাড়িতে একসঙ্গে দুটো বিয়ে হচ্ছে। একতলায় অন্য দল, জোজোর মাসির বিয়ে দোতলায়। জোজোর ওপরে দায়িত্ব পড়েছে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু তাদের অতিথিদের দোতলার সিঁড়ি দেখিয়ে দেওয়া।

দু'দিকে দুটো গেট, সিঁড়িও আলাদা। ফুল দিয়ে দু'জোড়া বর-কনের নাম লেখা আছে দু'দিকের গেটে। বারবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে করতে জোজোর পা ব্যথা হয়ে গেছে।

তার বারবার মনে পড়ছে, সন্তু-কাকাবাবুরা এই সময় জঙ্গলে গিয়ে কতরকম মজা করছে, আর সে একা-একা পড়ে আছে কলকাতায়। এই পুরু নামের ছেলেটার সঙ্গে সন্তুর বেশি বন্ধুত্ব হয়ে যাবে ?

কাকাবাবু হঠাৎ উত্তরবাংলার জঙ্গলে গেলেন কেন ? শুধু বেড়াতে ? না কি ওখানে কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন ? কিংবা ওখানে পড়ে আছে কোনও উল্কার টুকরো ? কিংবা ইয়েতির মতন অদ্ভুত কোনও প্রাণীর দেখা পাওয়া গেছে ওখানে ?

জোজোর মাসির তিনজন বান্ধবী ভুল করে ঢুকে যাচ্ছে একতলার বিয়েবাড়ির দিকে। জোজো ওদের চেনে, তবু এগিয়ে গিয়ে কিছু বলল না। যাক না ওদিকে! সব বিয়েবাড়িতে কত লোকজন আসে। সবাই তো সবাইকে চেনে না। কেউ কিছু বলবে না। ওরা ভেতরে গিয়ে বিয়ের কনেকে দেখে লজ্জা পেয়ে যাবে।

একতলার বিয়েবাড়িতে কী কী খাওয়াচ্ছে ? ওদের কি আইসক্রিম আছে ? জোজো একবার ভাবল, ওদিকটায় গিয়ে একবার দেখে আসবে।

সেই তিনটি মেয়ে ফিরে আসছে।

তারা জোজোকে দেখতে পেয়ে কিছু বলার আগেই জোজো বলল, "ওমা প্রিয়াঙ্কামাসি, তোমরা ওদিকে খেয়ে এলে বুঝি ? এবার এদিকে খাবে ?"

প্রিয়াঙ্কা নামে মেয়েটি বলল, "এই পাজি ছেলে, তুই আমাদের দেখতে পাসনি ? আমরা ওদিকের মেয়েটাকে উপহারটা প্রায় দিয়ে ফেলছিলুম আর একটু হলে। এমন লজ্জায় পড়তে হল।"

জোজো নিরীহ মুখ করে বলল, "আমি তোমাদের ডাকবার আগেই তো তোমরা ওদিকে হড়বড় করে ঢুকে পড়লে। আমি ভাবলুম, তোমরা বুঝি ওদেরও চেনো!"

আবার একদল এসে পড়ায় জোজো তাদের দিকে চলে গেল।

বিয়ের উৎসব আর খাওয়াদাওয়া চুকতে চুকতে বেজে গেল রাত একটা। দোতলায় অনেক ঘর, অনেকে আজ রাতটা সেখানেই কাটাবে। জোজোর ঘুম এল না কিছুতেই। চোখ বুজলেই সে দেখতে পাচ্ছে একটা ঘন জঙ্গল। কিং কঙের মতন একটা গোরিলা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই জঙ্গলে। এদেশে তো গোরিলা নেই। তবে ওটা এল কোথা থেকে ? অন্য গ্রহ থেকে আসেনি তো ?

ভোর হতে না হতেই সে মাকে বলল, "মা, আমি সন্তু-কাকাবাবুদের কাছে যাচ্ছি। কয়েকদিন পরে ফিরব।"

মা বললেন, "সে কী! তুই বউভাতের দিন থাকবি না ?"

জোজো বলল, "আমার তো বিয়ে দিন শুধু ডিউটি ছিল। বউভাতে তো কিছু করবার নেই।"

মা তবু আপত্তি করলেও, জোজো অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করল। তারপর বাড়ি গিয়ে একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সোজা চলে এল হাওড়া স্টেশন।

এক ঘণ্টা পরেই একটা ট্রেন আছে উত্তরবাংলার। টিকিট কেটে উঠে পড়ল সেই ট্রেনে।

জোজো মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক, একা একা কোথাও যাওয়ার অভ্যেস নেই তার। দিনের বেলার ট্রেনে খুব ভিড়। তবু জোজো একটা কামরায় কোনওরকমে চেপেচুপে জায়গা পেয়ে গেল।

ট্রেনে উঠলেই জোজোর খিদে পায়। যদিও রাত্তিরবেলা বিয়ে বাড়ির খাওয়া খেয়েছে, কিন্তু একটু পরেই তার মন আনচান করতে লাগল। প্রথমে সে ঝালমুড়ি কিনল এক ঠোঙা। কয়েক স্টেশন পরে আলু-পরোটা আর কফি খেয়ে নিল। তারপর কিনে ফেলল অনেকখানি বাদাম। এইগুলো শেষ করতে করতে অনেকটা সময় কেটে যাবে। এইজন্যই চিনেবাদামের নতুন নাম হয়েছে টাইম-পাস!

জোজোর পাশে বসেছে একজন মাঝবয়েসি লোক, তার মুখ ভর্তি দাড়ি কিন্তু মাথাজোড়া টাক।

জোজো ভাবল, অনেক লোকের মাথার চুল উঠে গিয়ে টাক পড়ে, কিন্তু দাড়ি কেন উঠে যায় না ? আজ পর্যন্ত দাড়িতে টাক পড়া কোনও লোক তো সে দেখেনি!

অন্য যাত্রীরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নানান গল্প করছে। প্রথমে সিনেমার গল্প দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, এখন চলছে ডাকাতের গল্প।

পাশের দাড়িওয়ালা লোকটি একটা কৌটো থেকে কয়েকটা শোনপাপড়ি বার করে বলল, "একটা খাবে নাকি ভাই ? এটা বাড়িতে তৈরি ভাল জিনিস! ভেজাল নেই।"

কয়েকদিন ধরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, ট্রেনের কোনও সহযাত্রী আপনাকে কিছু খাবার জিনিস দিলে খাবেন না। সেইসব খাবারে অনেক সময় ঘুমের ওষুধ মেশানো থাকে। ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবেন, আপনার জিনিসপত্র সব উধাও হয়ে গেছে!

জোজো এই বিজ্ঞাপন পড়েছে। কিন্তু এমন টাটকা শোনপাপড়ি, সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে, এ কি প্রত্যাখ্যান করা যায় ? দাড়িওয়ালা লোকটিকে ঠিক চোর-ডাকাত মনে হয় না।

একটা শোনপাপড়ি তুলে নিয়ে জোজো বলল, "আপনিও আমার বাদাম খান।"

কথায় কথায় এই লোকটির সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। তার নাম বাবুল আহমেদ। তার তালপাতার পাখা তৈরির ব্যবসা। বাড়ি কুচবিহার। প্রায়ই কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে হয়।

একটা শোনপাপড়ি শেষ হওয়ার পর সে জিজ্ঞেস করল, "ভাল লেগেছে ? তা হলে আর একটা খাও না। অনেক রয়েছে। দুটোও নিতে পারো।"

এরকম অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। জোজো দুটো শোনপাপড়ি নিয়ে নিল। সত্যি ভারী অপূর্ব স্বাদ।

এদিকে ডাকাতির গল্প চলছেই। প্রত্যেকেই যেন একটা-না-একটা ডাকাতির গল্প জানে।

বাবুল আহমেদ জোজোকে নিচু গলায় বলল, "তোমাকে একটা জিনিস শিখিয়ে দিই। উত্তরবাংলায় যাচ্ছ তো। যদি কখনও চোর-ডাকাতদের পাল্লায় পড়ো, বাঁচবার একটা সহজ উপায় আছে। চোর-ডাকাতদের সামনে বুক ফুলিয়ে বলবে, আমি কে জানো? আমি শঙ্কর রায়বর্মনের দলের লোক। দেখবে, অমনই ম্যাজিকের মতন কাজ হবে। চোর-ডাকাতরা দৌড়ে পালাবে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "শঙ্কর রায়বর্মন কে?"

বাবুল আহমেদ বলল, "তা তোমার জানার দরকার নেই। শুধু নামটা বলতে পারলেই হল। চোর-ডাকাতরা ওই নামটাকে যমের মতন ভয় পায়। আমি দু'বার এইভাবে রক্ষা পেয়েছি। নামটা মুখস্থ করে নাও!"

জোজো দু'বার বলল, "শঙ্কর রায়বর্মন, শঙ্কর রায়বর্মন!"

বাদামগুলো শেষ করতে পারল না জোজো। তার আগেই তার ঘুম এসে গেল। একেবারে গভীর ঘুম।

এক সময় একজন কেউ তাকে ঠেলাঠেলি করে বলতে লাগল, "ও ভাই ওঠো! ওঠো! নিউ জলপাইগুড়ি এসে গেছে!"

জোজো ধড়মড় করে উঠে পড়ে বলল, "অ্যাঁ? কী হয়েছে? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? আমার ব্যাগ কোথায়? ব্যাগ? শোনপাপড়ি, শোনপাপড়িতে ঘুমের ওষুধ ছিল! আমার ব্যাগ! যাঃ, চুরি হয়ে গেছে! সেই লোকটা, সেই লোকটা...।"

লোকটি বলল, "কী আবোল তাবোল বলছ! ওই তো সিটের নীচে তোমার ব্যাগ রয়েছে। তোমার পাশের লোকটি এক স্টেশন আগে নেমে গেল।"

সত্যিই তাই, ব্যাগটা চুরি যায়নি। কিছুই হয়নি।

এবার জোজো ধাতস্থ হল। আগের রাত্তিরে সে একটুও ঘুমোয়নি, তাই এত ঘুম পেয়েছিল। ঘুমের ওষুধটষুধ ছিল না, বাবুল আহমেদ ভালবেসেই তাকে শোনপাপড়ি খেতে দিয়েছিল।

এই তো হয়, একজন-দু'জন চোর-ডাকাতের জন্য সব অচেনা লোককেই সন্দেহ করতে হয়।

ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ল জোজো। জলপাইগুড়ির ডি এম সাহেবের কাছে খোঁজ করতে হবে, সন্তু বলে দিয়েছিল, সেটা মনে আছে। কিন্তু সেখানে কী করে যাওয়া যাবে।

স্টেশনের বাইরে এসে দেখল, ট্যাক্সি আছে বটে, কিন্তু অনেক ভাড়া লাগবে। অত টাকা জোজো দিতে পারবে না। তবে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত শেয়ারের ট্যাক্সি যায়, তাতে অনেক কম খরচ।

সে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতেই উঠে বসল।

জলপাইগুড়িতে এসে নামার পর লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানল যে, ডি এম সাহেবের বাংলো পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাবে না। সাইকেল রিকশা নিতে হবে!

এর মধ্যে রাত হয়ে গেছে। এরকম অচেনা জায়গায় একা একা সাইকেল রিকশায় চেপে জোজো আগে কখনও যায়নি। হঠাৎ তার মাথায় একটা দুশ্চিন্তা এসে গেল। যদি ডি এম সাহেব এখন বাড়িতে না থাকেন? যদি তিনি অফিসের কাজে অন্য কোথাও যান? তা হলে জোজোকে তো এখানে কেউ চিনবে না। তা হলে সে রাত্তিরে থাকবে কোথায়? হোটেলে থাকার মতন অত টাকাও তার সঙ্গে নেই। তার বয়েসি ছেলেকে কি একা কোনও হোটেলে থাকতে দেয়?

এর মধ্যেই রাস্তা একেবারে নির্জন। গাড়িও বিশেষ নেই। ট্রেনে অনেক ডাকাতির গল্প শুনে জোজোর খালি মনে হচ্ছে, এই সময় হঠাৎ যদি কোনও ডাকাত এসে ধরে? তা হলে

কী যেন একটা নাম বলতে হবে ? শঙ্কর রায়বর্মন, শঙ্কর রায়বর্মন! জোজো মনে মনে বারবার সেই নামটা বলতে লাগল!

সাইকেল রিকশাওলা তাকে নামিয়ে দিল ডি এম সাহেবের বাংলোর সামনে।

গেটের কাছে একজন বন্দুকধারী পাহারাদার। সে জোজোকে দেখেও কিছু বলল না। জোজো এগিয়ে গিয়ে সদর দরজার বেল টিপল।

দরজা খুলে দিল একজন আর্দালি। কে জিজ্ঞেস করল, "কী চাই ?"

জোজো বলল, "ডি এম সাহেব আছেন ?"

আর্দালিটি বলল, "আছেন। কিন্তু এখন দেখা হবে না।"

জোজো বলল, "আমার বিশেষ দরকার!"

আর্দালিটি বলল, "আটটা বেজে গেছে। এর পর আর তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। হুকুম নেই।"

আর্দালিটি দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, জোজো বলল, "ওঁকে গিয়ে বলো, আমি শঙ্কর রায়বর্মনের লোক। তা হলে উনি ঠিক দেখা করবেন।"

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আর্দালিটির মুখ শুকিয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে সে বলে উঠল, "অ্যাঁ ? অ্যাঁ ? ওরে বাবা রে, গার্ড, গার্ড শিগগির ইধার আও! স্যার, সাহেব, এসে গেছে! ওদের লোক।"

গেটের পাহারাদারটি ছুটে এসে রাইফেল বাগিয়ে ধরল জোজোর দিকে। ভেতরের সিঁড়িতে দুমদাম পায়ের আওয়াজ হল। রণবীর গুপ্ত এগিয়ে এলেন, হাতে রিভলভার।

তিনি কড়া গলায় বললেন, "তুমি কে ? চিঠি এনেছ ?"

জোজো বলল, "চিঠি তো আনিনি। আমি, মানে "

রণবীর গুপ্ত বললেণ, "তা হলে কেন এসেছ ?"

জোজো বলল, "কাকাবাবুরা কোথায় আছেন, সেখানে আমাকে যদি পৌঁছে দেন।"

রণবীর গুপ্ত বললেন, "সেখানে আমি তোমাকে পৌঁছে দেব ?"

জোজো বলল, "আমি সন্তুর বন্ধু। কাকাবাবু আমাকে চেনেন। সন্তুই আমাকে আসতে বলেছে।"

রণবীর গুপ্ত বললেন, "সন্তু তোমাকে আসতে বলেছে ? তা হলে তুমি প্রথমে এসে কার নাম বললে ?"

জোজো এবার জিভ কেটে ফেলে বলল, "এই যাঃ! ভুল করে বলে ফেলেছি!"

রণবীর গুপ্ত বললেন, "এখন উলটোপালটা কথা বলা হচ্ছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, এক পাও এগোবে না।"

তিনি আর্দালিকে বললেন, "ওর বডি সার্চ করে দেখো তো, বোমা টোমা লুকিয়ে রেখেছে কি না!"

আর্দালি কাঁচুমাচু ভাবে বলল, "স্যার, গায়ে হাত দিলে যদি বোমা ফেটে যায় ?"

রণবীর গুপ্ত বললেন, "ঠিক বলেছ। ওহে ছোকরা, তোমার ব্যাগে যা জিনিসপত্র আছে, সব বার করে দেখাও। তারপর তুমি মাটিতে শুয়ে দু'বার গড়াগড়ি দাও, দেখতে চাই তোমার গায়ে বোমা বাঁধা আছে কি না!"

জোজো বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি সন্তুর খুব বন্ধু। সন্তু আমাকে দেখলেই..."

রণবীর গুপ্ত বললেন, "তা হলে তুমি আগে অন্য নাম বললে কেন ? কোনও কথা শুনতে চাই না, মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দাও, নইলে আমি গুলি করব।"

অগত্যা জোজোকে নিজের ব্যাগটা খুলে উলটে দিতে হল। নিজে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

গার্ড, আর্দালি, রণবীর গুপ্ত নিজেও খানিকটা দূরে সরে গেলেন।

দু'বার গড়াগড়ি দেওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে জোজো বলল, "দেখলেন, দেখলেন! কিছু নেই!"

রণবীর তবুও সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, "তোমার ব্যাগের জিনিসপত্রের মধ্যে ওই চৌকোমতন জিনিসটা কী ?"

জোজো বলল, "বোমা! আরে না, না, কী যে ভুল হয়ে যাচ্ছে। বলতে চাইছি, বোমা নয়, রসগোল্লা। বিয়েবাড়ির। অনেক রসগোল্লা বেশি হয়ে গিয়েছিল তো, তাই একটা টিনের কৌটোয় করে কাপড় দিয়ে বেঁধে এনেছি আপনাদের জন্য!"

রণবীর গুপ্ত বললেন, "ওটা খুলে দেখাও!"

জোজো খোলার চেষ্টা করেও খুলতে পারছে না, সে নিজেই এত শক্ত করে গিঁট বেঁধেছে যে, দারুণ আঁট হয়ে গেছে।

আর্দালিটি বলল, "স্যার, আমার মনে হচ্ছে, ওটার মধ্যেই..."

রণবীর গুপ্ত রিভলভার তাক করে আছেন। কড়া গলায় বললেন, "কোনওরকম চালাকির চেষ্টা কোরো না।"

ঠিক এই সময় একটা গাড়ি এসে থামল। তার থেকে নেমে এল সন্তু আর পুরু।

তাদের দেখে একগাল হেসে জোজো বলল, "কী রে, সন্তু, দ্যাখ, আমি ঠিক এসে গেছি।"

জোজোকে দেখে সন্তুর মুখে কোনও খুশির ভাব ফুটল না। সে ফ্যাকাশে গলায় শুধু বলল, "তুই এসেছিস ?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, আসব না মানে ? তোর মুখখানা এমন আমসির মতন হয়ে আছে কেন ? সারাদিন কিছু খাসনি বুঝি ? নে, রসগোল্লা খা। ছোটমাসির বিয়ের রসগোল্লা!"

এর-মধ্যে গিঁট খুলে ফেলেছে জোজো। প্রথমে রণবীর গুপ্তর কাছে কৌটোটা নিয়ে গিয়ে বলল, "নিন, আপনি আগে খেয়ে দেখুন! কলকাতার বেস্ট রসগোল্লা!"

রণবীর গুপ্ত সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ তোমার বন্ধু ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, এর নাম জোজো। এর নানারকম কাণ্ডকারখানার কথা শোনেননি আপনি ?"

রণবীর গুপ্ত এবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

গার্ড, আর্দালিরাও হাসতে লাগল। তারপর সবাই মিলে খেতে লাগল রসগোল্লা।

সন্তু জোজোকে বলল, "চল, আমার ঘরে চল। অনেক কথা আছে। এর মধ্যে সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে।"

পুরুকে নিয়ে ওরা চলে গেল ওপরে। সার্কিট হাউজের বদলে ওরা এখন ডি এম সাহেবের বাংলোতে রয়েছে। মিলিকাকিমা অনবরত কাঁদছেন, নিজের বিছানা ছেড়ে উঠছেনই না। তিনি কিছুতেই কলকাতায় ফিরে যেতেও রাজি নন।

ঘরের মধ্যে এসে জোজো বলল, "আগে এক গেলাস জল খাওয়া তো সন্তু!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এ কী, তোর জামায় এত ধুলো কাদা লাগল কী করে ? আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলি ?"

জোজো বলল, "না, না, তোরা বাড়ি ছিলি না, ততক্ষণ আমি ডি এম সাহেবকে ম্যাজিক দেখাচ্ছিলাম।"

"ম্যাজিক ?"

"হ্যাঁ, এটা আমি যেবার হনুলুলু যাই, সেখানে শিখেছি। সেখানে একজন ম্যাজিশিয়ান ছিল, তার নাম আলাপাগোস, দুর্দান্ত সব খেলা জানে। সে আমাকে এটা শিখিয়ে দিয়েছিল।"

"কীরকম ম্যাজিক ?"

জোজো একগাল হেসে বলল, "তোরা পারবি না। প্রথমে মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে। ঘরের মধ্যে হবে না, বাইরে খোলা জায়গায়। তারপর দু'বার গড়াগড়ি দিলেই পেটটা ফুলতে শুরু করবে। ঠিক যেন বেলুনের মতন, ফুলতে ফুলতে এত বড় হবে যে, মনে হবে এক্ষুনি ফেটে যাবে! তারপর নিজেই দুম ফটাস আওয়াজ করলে সবাই চমকে যাবে। তখন দেখা যাবে, পেটটা একই রকম আছে!"

॥ ৭ ॥

জিপগাড়িতে ওঠার পর কাকাবাবু আর গৌতমকাকুর চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

কাকাবাবু গৌতমকাকুকে বললেন, "বাধা দিয়ো না। দ্যাখোই না কী হয়। ভয়ের কিছু নেই।"

গৌতমকাকু বললেন, "আমি মোটেই ভয় পাইনি। তুই তো সঙ্গে আছিস!"

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, "মিস্টার শঙ্কর রায়বর্মন, আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? আপনাকে কী বলে ডাকব?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "হ্যাঁ, যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন। আসলে মিস্টার বলার দরকার নেই। হয় রাজাবাবু বলবেন, অথবা পুরোপুরি নাম, শঙ্কর রায়বর্মন! শঙ্করবাবুটাই চলবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে প্রথমটা জানতে পারি কি, কেন আপনার নাম রাজাবাবু?"

"আমার নাম রাজাবাবু নয়। রাজাকে তো সবাই রাজাই বলবে। আমি এখানকার রাজা। আমি দলিলপত্র দেখিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারি যে, আমার পূর্বপুরুষ এই জঙ্গল মহলের রাজা ছিল। ইংরেজরা জোর করে সেটা দখল করে নিয়েছিল, এখন আমি ভারত সরকারের কাছ থেকে সেই রাজত্ব ফেরত চাই।"

"এখনকার দিনে কি রাজা কিংবা রাজত্ব বলে কিছু আছে? সবই তো স্বাধীন ভারতের অংশ।"

"বাজে কথা! নেপাল, ভুটান, এইসব দেশে রাজা নেই? আমার এই জঙ্গল মহলও সেরকম আলাদা রাজত্ব হবে।"

"নেপাল আর ভুটান তো ভারতের মধ্যে ছিল না কখনও। কিন্তু কুচবিহার কিংবা ত্রিপুরা ভারতে ঢুকে গেছে।"

"তর্ক করবেন না, তর্ক করবেন না। কুচবিহার, ত্রিপুরার রাজারা ভিতু ছিল, লড়াই করেনি। আমি যুদ্ধ করে জিতে নেব। সেইজন্যই সৈন্যবাহিনী তৈরি করছি। আমার অনেক টাকা চাই।"

"আমাদের মতন নিরীহ মানুষদের ধরে রেখে টাকা আদায় করবেন? আমরা তো অত টাকা দিতে পারব না।"

"তা হলে আপনাদের মতন ক'টাকে মেরে ফেলতে হবে। হাত-পা কেটে, মুণ্ডু কেটে বাইরে ফেলে দিয়ে আসব। তা হলেই অন্যরা ভয়ে টাকা দেবে! আপনাকে পেয়ে আমার দারুণ লাভ হল।"

"কেন, আমি তো আগেই বলেছি, আমি টাকা দিতে পারব না।"

"টাকা না পেলেও চলবে। সবাই জানে, রাজা রায়চৌধুরী, সবাই যাকে কাকাবাবু বলে জানে, তার দারুণ বুদ্ধি, সব বিপদ থেকে উদ্ধার পায়। কিন্তু আমার হাত থেকে আপনি কিছুতেই পালাতে পারবেন না। আপনাকে টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেললে সবাই বুঝবে, আমার কতখানি শক্তি!"

"আমি খোঁড়া মানুষ, দৌড়ে পালাতে পারি না। আমাকে মেরে ফেলা তো খুব সহজ। কিন্তু এই সহজ কাজটাও কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ পারেনি।"

"এবার দেখুন। দশদিন অপেক্ষা করব। গভর্নমেন্ট বা অন্য কেউ যদি আপনার হয়ে বিশ লাখ টাকা দেয়, তা হলে আর মারব না। কিন্তু সেটাও তো আপনার পরাজয় হবে, তাই না?"

"তা বটে কিন্তু কেউ অত টাকা দেবে না।"

"আপনার বন্ধুটি তো আমেরিকার ডাক্তার। ওদের অনেক টাকা। ওকে বলুন, আপনাদের দু'জনের টাকা দিয়ে দিতে।"

গৌতমকাকু বললেন, "আমেরিকায় টাকা গাছে ফলে না। অনেক পরিশ্রম করে রোজগার করতে হয়। আমার পরিশ্রমের টাকা আমি যাকে-তাকে দেব কেন?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "যাকে-তাকে? হুঁঃ, ক'টা দিন যাক, তারপর এই তেজ কোথায় থাকে, দেখব!"

খানিক পরে জিপগাড়িটা থেমে গেল।

তখনও কাকাবাবুদের চোখের বাঁধন না খুলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কিছুদূর। সেখানে ঠিক কোনও রাস্তা নেই, এগোতে হচ্ছে ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে কাকাবাবুর।

একবার তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

শঙ্কর রায়বর্মন তাঁর কোটের কলার ধরে টেনে তুলে বলল, "চালাকি করার চেষ্টা করছেন নাকি? কোনও লাভ নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ক্রাচ একটা লতায় জড়িয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে চালাকির কী আছে?"

গৌতমকাকু বললেন, "আপনি মশাই নিজেকে রাজা বলছেন। ওর নামও রাজা। রাজার প্রতি রাজার মতন ব্যবহার করুন।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "শাট আপ!"

একটু পরে একটা খাটিয়ার ওপর ওদের বসিয়ে দিয়ে খুলে দেওয়া হল চোখের বাঁধন।

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখলেন।

জায়গাটা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। নিরেট অন্ধকারের মধ্যে শুধু একটা মশাল জ্বলছে দাউ দাউ করে। ঘরটর কিছু নেই, শুধু ফাঁকা জায়গায় কয়েকটা খাটিয়া পাতা।

আর একটা খাটিয়ায় একজন প্যান্ট-কোট পরা লোক দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে।

শঙ্কর রায়বর্মন তাকে দেখিয়ে বলল, "একে চেনেন? এর নাম প্রমথ বসু, একটা চা-বাগানের ম্যানেজার। কালকে ওর জন্য কুড়ি লাখ টাকা পৌঁছে দেওয়ার শেষ দিন। টাকাটা যদি কাল সূর্যাস্তের মধ্যে না আসে, তা হলে দেখবেন, আপনাদের চোখের সামনে ওর একটা হাত কেটে ফেলা হবে।"

সে-কথা শুনেও প্রমথ বসু মুখ থেকে হাত সরালেন না।

জঙ্গলের ভেতর থেকে টর্চ হাতে এগিয়ে এল একজন। কাছে আসতে বোঝা গেল, সে একজন মহিলা। তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়েস, মুখখানা সুন্দর, একটা কালো কাপড় পরা।

সে শঙ্কর রায়বর্মনকে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবুকে ধরতে পেরেছ? কোনজন গো কাকাবাবু?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "ওই যে গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক। ওকে ধরতে গিয়ে আর-একটি রাঘব বোয়ালও পেয়েছি। এর মাথার দাম মিনিমাম পঞ্চাশ লাখ।"

মহিলাটি বলল, "গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড!"

তারপর কাকাবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার তো খুব বুদ্ধি শুনেছি। আপনি আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে এখান থেকে পালাতে পারবেন?"

কাবাবাবু হাসলেন।

মহিলাটি কাকাবাবুর গায়ে টর্চের খোঁচা দিয়ে বলল, "চুপ করে রইলেন কেন? উত্তর দিন!"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু বুদ্ধি দিয়ে কি আর পালানো যায়? পালাতে গেলে দৌড়োতে হয়। আমার তো দৌড়োবার ক্ষমতাই নেই।"

মহিলাটি বলল, "আমি শঙ্করের সঙ্গে বাজি ফেলেছি। কী বাজি তা বলব না। ও যদি আপনার ডান হাতটা কেটে ফেলতে পারে, তা হলেই আমি ওর কাছে বাজি হেরে যাব।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আমি তো এক্ষুনি কেটে ফেলতে পারি। দেখবে?"

মহিলাটি বলল, "যাঃ, তা হলে আর মজা রইল কী। ওঁকে কয়েকটা দিন অন্তত পালাবার সুযোগ দাও!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আমার সেনাবাহিনীটা এখনও তেমন বড় নয়। কিন্তু যে-ক'জন আছে, তারা প্রত্যেকে আমার জন্য জান লড়িয়ে দিতে পারে। এই জায়গাটা ঘিরে দশজন পাহারা দিচ্ছে। তাদের নজর এড়িয়ে কাকপক্ষীটিও ঢুকতে বা বেরোতে পারবে না।"

মহিলাটি বলল, "এখানে কোনওদিন পুলিশও আসতে পারবে না। যদি ভাবেন যে, পুলিশ এসে আপনাদের উদ্ধার করবে, তা হলে সে গুড়ে বালি। শুনুন কাকাবাবু, আমার নাম মহাদেবী। আপনি পালাবার চেষ্টা করে আমাকে বাজিতে জিতিয়ে দিন না! অবশ্য আমি আপনাকে কোনওরকম সাহায্য করব না।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আমার সঙ্গে বাজিতে জেতা অত সহজ নয়, বুঝলে মহাদেবী! কুড়ি লাখ টাকা কিংবা ডান হাত কাটা, আমার যে-কোনও একটা চাই! খিদে পেয়ে গেছে, কিছু খাবারটাবার ব্যবস্থা করো!"

রাত্তিরের খাবার শুধু কয়েকখানা রুটি আর খানিকটা গুড়। আর এক জগ জল।

মহাদেবী আর শঙ্কর রায়বর্মন অন্য কোথাও চলে গেছে। পাশাপাশি দুটো খাটিয়ায় শুয়ে পড়লেন কাকাবাবু আর গৌতমকাকু। অন্য একটা খাটিয়ায় প্রমথ বসু। বাকি খাটিয়াগুলো ফাঁকা, এখানে কেউ পাহারা দিচ্ছে না।

কাকাবাবুদের হাত-পাও বাঁধা নয়।

কিন্তু এত গভীর রাতে নিরস্ত্র অবস্থায় পালাবারও প্রশ্ন নেই। তা ছাড়া নিশ্চয়ই ওরা দূর থেকে নজর রেখেছে।

একটু পরে প্রমথ বসু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে-কাঁদতেই আপনমনে বলতে লাগলেন, "আমার মেয়ের বয়েস মাত্র তিন বছর। সে তার বাবাকে আর দেখবে না। আমার স্ত্রী, আমার মা, আমার মা এখনও বেঁচে আছেন...'

গৌতমকাকু ফিসফিস করে বললেন, "সত্যি সত্যি মেরে ফেলবে নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "এরা সাধারণ ডাকাত নয়। শঙ্কর রায়বর্মন আর ওই মহাদেবী নামের মহিলাটি, দু'জনকেই মনে হয় শিক্ষিত। অথচ কত অবলীলাক্রমে হাত-পা কেটে ফেলার কথা বলছে! মানুষ কত নিষ্ঠুর হয়ে গেছে।"

গৌতমকাকু বললেন, "ওই শঙ্কর রায়বর্মনটা তো পাগল। পাগল না হলে কেউ এ যুগে রাজ্য উদ্ধার করে রাজা হতে চায়? কিছুদিন এই ভাবে চালাবে, তারপর গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই আর্মি পাঠিয়ে ওদের শেষ করে দেবে!"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও ওকে একধরনের পাগল বলেই মনে হয়েছে।"

গৌতমকাকু বললেন, "এই ধরনের পাগলরা বেশি বিপজ্জনক। কখন যে কী করবে ঠিক নেই। হাসতে-হাসতে বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। রাজা, আমাদের কী হবে, সত্যি এখান থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারব?"

কাকাবাবু বললেন, "দশদিন সময় দিয়েছে। প্রথম দু'-একদিন অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নিই! তোদের এখানে এনে দারুণ বিপদের মধ্যে ফেলে দিলাম!"

গৌতমকাকু বললেন, "আমরা তো ইচ্ছে করেই এসেছি। সত্যি যে এরকম হবে, ভাবতে পারিনি। তোর ওপর আমার ভরসা আছে। একটা কিছু হবেই!"

খানিকটা পরে ঘুমিয়ে পড়লেন দু'জনেই। প্রমথ বসু কেঁদেই চলেছেন।

ভোরবেলা দারুণ চ্যাঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল।

দূর থেকে হেঁটে আসছে শঙ্কর রায়বর্মন, তার পোশাক আজ অন্যরকম। পাজামার ওপর একটা জরি-বসানো আলখাল্লা পরা, মাথায় একটা লাল ফেট্টিতে পালক গোঁজা। অনেকটা রাজা-রাজা ভাব।

তাকে ঘিরে ধরে লাফাতে লাফাতে আসছে তার অনুচরেরা। একজন একটা বাঁশি বাজাচ্ছে।

গৌতমকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "আজ এদের উৎসব আছে নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখোই না কী হয়!"

শঙ্কর রায়বর্মন কাছাকাছি এসে দাঁড়াবার পর তার অনুচররা মাটিতে শুয়ে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে লাগল।

অন্য একদিক থেকে মহাদেবী এসে চিৎকার করে বলল, "আজ আমাদের তিন নম্বর জয় হল! চা-বাগানের ম্যানেজারের নামে কুড়ি লাখ টাকা আজ ভোরবেলাই পৌঁছে গেছে! ম্যানেজার, তুমি আজ ছুটি পাবে!"

প্রমথ বসুও উঠে বসেছেন। মাথার চুল উশকোখুশকো। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা ভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, যেন তাঁর মুক্তির কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

মহাদেবী তাঁর পাশে গিয়ে বলল, "নিন, উঠে পড়ুন। রাজাকে প্রণাম করুন। আপনার ডান হাতখানা একটুর জন্য বেঁচে গেল। আর একটু দেরি হলেই—"

প্রমথ বসু উঠে দাঁড়ালেন। দু'জন লোক তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল শঙ্কর রায়বর্মনের কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে শঙ্কর রায়বর্মনের পায়ে হাত দিলেন।

মহাদেবী তখন কাকাবাবুদের দিকে ফিরে বলল, "যান, আপনারাও গিয়ে প্রণাম করুন।"

গৌতমকাকু বললেন, "আমরা কেন প্রণাম করতে যাব ? আমাদের থেকে বয়েসে ছোট!"

ভীমের মতন চেহারার একজন লোক ওঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে বলল, "উঠুন, উঠুন!"

গৌতমকাকু বললেন, "না, আমি যাব না!"

সেই লোকটা হাঁটু দিয়ে গৌতমকাকুর পিঠে একটা ধাক্কা দিল।

কাকাবাবু বললেন, "চলো গৌতম, এরা যা বলছে করতেই হবে। শুধু শুধু মার খেয়ে লাভ নেই।"

দু'জনে উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে লাগলেন শঙ্কর রায়বর্মনের দিকে।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "যদি বেঁচে থাকি, এর প্রত্যেকটি ব্যাপারের প্রতিশোধ নেব!"

## ॥ ৮ ॥

পুলিশ মহলে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন ভাবেই হোক, কাকাবাবু আর তাঁর বন্ধুকে উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু ওঁদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, তাও দেখতে হবে।

কলকাতা থেকে অনেক বড় বড় পুলিশ অফিসার এসে গেছেন। ঘন ঘন মিটিং বসছে। জঙ্গলের মধ্যে শঙ্কর রায়বর্মনের ডেরা খুঁজে বার করা হয়তো খুব শক্ত নয়। কিন্তু লোকটা দারুণ নিষ্ঠুর। কাছাকাছি পুলিশ এলেই বন্দিদের হাত-পা কেটে ফেলার ভয় দেখায়। এর আগে সত্যিই একজন সরকারি অফিসারের ডান হাত কেটে পাঠিয়েছিল।

তা ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় শঙ্কর রায়বর্মনের স্পাই আছে। পুলিশ কখন কোন দিকে যাচ্ছে, তা আগে থেকেই তারা শঙ্কর রায়বর্মনকে জানিয়ে দেয়। পুলিশের মধ্যেও তাদের স্পাই থাকতে পারে। গ্রামের লোকেরা ভয়ে শঙ্কর রায়বর্মন সম্পর্কে কোনও কথাই বলতে চায় না।

হলং থেকে আমজাদ আলিকে ডেকে আনা হয়েছে।

শঙ্কর রায়বর্মনকে যে ঠিক কীরকম দেখতে, তা অনেকেই জানে না। সে নাকি নানারকম ছদ্মবেশে থাকে। কখনও সে পুলিশের মতন, কখনও ডিমওয়ালা, কখনও থুত্থুরে বুড়ো। এরকম ছদ্মবেশে সে মাঝে-মাঝে জঙ্গল ছেড়ে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি শহরেও আসে।

আমজাদ আলি তাকে দু'বার দেখেছেন। ঠিক মুখোমুখি নয়, খানিকটা দূর থেকে। আমজাদ আলি হয়তো শঙ্কর রায়বর্মনকে চিনতে পারবেন।

সন্তুর কাছ থেকেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানা গেছে। শঙ্কর রায়বর্মন আর তার সঙ্গীদের কাছে দুটো এ কে ফরটি সেভেনের মতন সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র আছে বটে, কিন্তু তার গুলি নেই। ও দুটো দিয়ে লোকদের ভয় দেখায়। ওদের আছে শুধু কয়েকটা রিভলভার আর কয়েকটা তলোয়ার, এই দিয়েই এত কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং একবার ওদের ঘিরে ফেলতে পারলে কাবু করে ফেলা যাবে সহজেই।

কিন্তু তার আগে নিশ্চিত হতে হবে, যাতে কাকাবাবু ও গৌতম হালদারের কোনও ক্ষতি না হয়।

কলকাতা থেকে অতনু সরকার নামে যে ডি আই জি এসেছেন, তিনি বললেন, ওই লোকটা কাকাবাবুর হাত-পা কেটে ফেলবে। তা আমি বিশ্বাস করি না। এ পর্যন্ত কেউ পারেনি। কাকাবাবু ঠিক যে-ভাবেই হোক ওর চোখে ধুলো দেবেন।

রণবীর গুপ্ত বললেন, "এ পর্যন্ত কেউ পারেনি বলে যে এবারেও পারবে না, তার কি কোনও মানে আছে? এই ঝুঁকি নেওয়া যায় না।"

এস পি সাহেব জাহাঙ্গির চৌধুরী বললেন, "কাকাবাবু এই ধরনের অপরাধী অনেক দেখেছেন। কিন্তু ওঁর বন্ধুর তো এসব অভিজ্ঞতা নেই। তা ছাড়া উনি আমেরিকার নাগরিক। ওঁর কোনও ক্ষতি হলে আমাদের দেশেরই দারুণ বদনাম হয়ে যাবে।"

রণবীর গুপ্ত বললেন, "গৌতমবাবুর স্ত্রী টাকা দিতে রাজি আছেন। কুড়ি-পঁচিশ লাখ উনি এদেশ থেকেই জোগাড় করতে পারবেন। একটু দরাদরি করলে পঞ্চাশ লাখ থেকে কমিয়ে বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশ লাখে রাজি করানো যেতে পারে শঙ্কর রায়বর্মনকে।"

অতনু সরকার বললেন, "আমরা সরকারি লোক হয়ে তো টাকা দেওয়ার ব্যাপারটায় অংশ নিতে পারি না। আমাদের কিছু না-জানার ভান করতে হবে।"

রণবীর গুপ্ত বললেন, "একবার টাকা পেলে শঙ্কর রায়বর্মন কিছুতেই কাকাবাবুকে এমনি এমনি ছাড়বে না। কাকাবাবুর টাকা কে দেবে?"

অতনু সরকার জিজ্ঞেস করলেন, "একজন চা-বাগানের ম্যানেজারকেও তো ধরে রেখেছে। রায় বর্মনের কাছ থেকে চিঠিপত্র নিয়ে আসে কে?"

জাহাঙ্গির চৌধুরী বললেন, "একজন লোককে পাঠায়। সে বোবা আর কালা। তার কাছ থেকে তো কোনও কথাই জানার উপায় নেই। তাকে অনুসরণ করেও কোনও লাভ হয় না। সে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকে। অত যাত্রীদের মধ্যে কে যে কখন ওর কাছে চিঠি দিয়ে যায়, তা বোঝা যায় না।"

অতনু সরকার বললেন, "ওই বোবা-কালা লোকটাকে একবার দেখলে হয়। অনেক বোবা-কালা কিন্তু আসলে কথা বলতে পারে, একটু হুড়কো দিলেই মুখ ছুটবে।"

জাহাঙ্গির চৌধুরী বললেন, "লোকটাকে ধরে আনা যায়, কিন্তু..."

রণবীর গুপ্ত বললেন, "শঙ্কর রায়বর্মনের প্রত্যেক চিঠিতে লেখা থাকে, আমার দূতের ওপর যদি কোনও অত্যাচার করা হয়, তা হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে বদলা নেব। বন্দিদের একজনের হাত কিংবা পা কেটে পাঠাব। একবার যে সত্যি একটা হাত কেটে পাঠিয়েছিল। লোকটা ঠিক খবর পেয়ে যায়।"

জাহাঙ্গির চৌধুরী বললেন, "লোকটা লেখাপড়া জানে। ইংরিজিতে চিঠি লেখে, ভাল ইংরিজি।"

অতনু সরকার বললেন, "লেখাপড়া-জানা ডাকাত!"

জাহাঙ্গির চৌধুরী বললেন, "ও তো নিজেকে বলে রাজা। কিং অব তরাই!"

অতনু সরকার বললেন, "হুঁঃ, রাজা না গজা। ওকে যেদিন ধরব, সেদিন কড়াইতে গরম তেলে ভাজব! এখন এক কাজ করুন, সরাসরি পুলিশ অ্যাকশান শুরু না করে আট-দশজন ইনফরমার ছড়িয়ে দিন চতুর্দিকে। তারা ওর গতিবিধির সন্ধান জানুক। ও তো মাঝে-মাঝে

শহরে আসে বললেন, সেই অবস্থায় ওকে ধরতে হবে। এর মধ্যে টাকা দিয়ে দরাদরি শুরু করুন, তাতে ও ভাববে ভয় পেয়ে আমরা ওকে টাকা দিতেই চাই। ফরেস্ট অফিসার আমজাদ আলিকেও কাজে লাগান। সে-ই তো লোকটার আসল চেহারাটা চেনে। আর একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি। ওই যে কাকাবাবুর ভাইপো সন্তু, ওকে চোখে চোখে রাখবেন। ও যে কখন দারুণ দুঃসাহস দেখিয়ে কী কাণ্ড করে বসবে, তার ঠিক নেই।"

সন্তু আর জোজো তখন সার্কিট হাউজের দোতলার বারান্দায় বসে গল্প করছে আমজাদ আলির সঙ্গে।

আমজাদ আলির মতন সন্তুও তো দেখেছে শঙ্কর রায়বর্মনকে। কিন্তু দু'জনের বর্ণনা মিলছে না।

শঙ্কর রায়বর্মন পুলিশের ছদ্মবেশে কাকাবাবুদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল। জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের মতন তার মুখে মস্ত বড় গোঁফ।

আমজাদ আলি বললেন, "আমি যখন ওকে দেখেছি, তখন ওর কোনওরকম গোঁফই ছিল না।"

সন্তু বলল, "থুতনির কাছে একটা কাটা দাগ।"

আমজাদ আলি বললেন, "আমি থুতনিতে কাটা দাগ দেখিনি, ঠোঁটে ছিল শ্বেতির মতন সাদা সাদা দাগ, আর নাকের ওপর আঁচিল।"

সন্তু বলল, "একবার মাথার টুপি খুলেছিল। মাঝখানে গোল টাক।"

আমজাদ আলি বললেন, "আমি দেখেছি, কপালের দিকে একটুখানি টাক, কিন্তু মাঝখানে তো অনেক চুল ছিল।"

জোজো বলল, "যেমন টাকের ওপর পরচুলা পরে অনেকে, তেমনই টাকওয়ালা পরচুলাও কিনতে পাওয়া যায়। থিয়েটারের লোকেরা পরে। আসল কথা হল নাক। বেশ খাড়া নাক নয়, বোঁচা নাক। নাক দিয়েই লোক চেনা যায়।"

সন্তু বলল, "খাড়া, টিকলো নাক।"

আমজাদ আলি বললেন, "আমি তো দেখেছি, খাড়াও নয়, বোঁচাও নয়, মাঝারি।"

জোজো বলল, "এই মাঝারি নাক নিয়েই খুব মুশকিল। মেক আপ দিয়ে মাঝারি নাককে টিকলো করা যায়, আবার বোঁচা বোঁচাও দেখানো যায়। কিন্তু সত্যিকারের টিকলো নাককে বোঁচা করা যায় না। ভুরু কীরকম?"

সন্তু বলল, "প্রায় যেন জোড়া।"

আমজাদ আলি বললেন, "আমি তো দেখেছি ফাঁক ফাঁক। আমাদেরই মতন।"

জোজো বলল, "সাদা কিংবা কালো রং দিয়ে দু'রকমই করা যায়।"

আমজাদ আলি বললেন, "সন্তু, তোমাদের কাছে শঙ্কর রায়বর্মন এসেছিল পুলিশের ছদ্মবেশে। তখন নিশ্চয়ই গোঁফ লাগিয়ে নানারকম মেক আপ নিয়ে এসেছিল। আমি জঙ্গলের মধ্যে যখন দেখেছি, তখন ওর ছদ্মবেশ ধরার কথা নয়। সেটাই ওর আসল চেহারা।"

জোজো বলল, "তার কোনও মানে নেই। সবসময়েই ও অনেকরকম ছদ্মবেশে ঘোরাঘুরি করতে পারে। যাতে ওর নিজের লোকও ওর আসল চেহারাটা জানতে পারবে না। কেউ ওকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিতে পারবে না।"

আমজাদ আলি বললেন, "তাও হয়তো ঠিক। আমার ধারণা, লোকটা সবসময় জঙ্গলে থাকে না। মাঝে-মাঝে সাধারণ লোকের মতন শহরে এসে থাকে। হয়তো শহরে ওর বাড়িও আছে। আমার একটা সন্দেহ হয়, সে-কথা কাউকে বলিনি, কারণ সেটা ভুলও হতে পারে।"

সন্তু বলল, "আমাদের বলুন!"

আমজাদ আলি বললেন, "জলপাইগুড়ি শহরে একজন ভদ্রলোক আছেন, তাঁকে দেখলেই আমার শঙ্কর রায়বর্মনের কথা মনে পড়ে। অথচ চেহারা কিংবা মুখের মিল নেই। তবু কিছু একটা যেন মিল আছে।"

জোজো বলল, "ভদ্রলোকের কী নাম? কী করেন তিনি?"

আমজাদ আলি বললেন, "ওঁর নাম নীলকণ্ঠ মজুমদার। একটা বইয়ের দোকানের মালিক। শান্তমতন লোক। আমি বই কিনতে গিয়ে কয়েকবার দেখেছি। কেন যে ওঁকে দেখলে শঙ্কর রায়বর্মনের কথা মনে পড়ে, তা আমি নিজেই বুঝি না!"

সন্তু বলল, "হয়তো ওঁরা দুই ভাই। নামের তো মিল আছে, শঙ্কর আর নীলকণ্ঠ তো একই। দুটোই শিবের নাম। আর পদবিটা ইচ্ছে মতন পালটে ফেলা যায়।"

জোজো বলল, "চলুন তো, লোকটাকে আমায় একবার দেখিয়ে দিন। আমি দেখলেই বুঝতে পারব, সে-ই আসল লোক কি না!"

আমজাদ আলি বললেন, "তুমি কী করে বুঝবে? তুমি তো একবারও আসল লোকটিকে দেখোইনি।"

জোজো অবহেলার সঙ্গে ঠোঁট উলটে বলল, "এসব আমার কাছে জলভাত। আমার একটা স্পেশ্যাল পাওয়ার আছে। কেউ মিথ্যে কথা বললেই আমি তার গন্ধ পাই। ওর আসল নাম নীলকণ্ঠ মজুমদার কি না, তা আমি একবার শুনলেই বুঝতে পারব। একবার কী হয়েছিল জানেন?"

সন্তু বলল, "তোর গল্পটা পরে শুনব। চল, বেরিয়ে পড়ি। লোকটাকে দেখে আসি।"

আমজাদ আলির জিপে ওরা সার্কিট হাউসের গেট দিয়ে বাঁ দিকে চলে গেল। একটু পরেই অন্যদিক দিয়ে পুলিশের লোক ডাকতে এল আমজাদ আলিকে। দেখা পেল না।

জিপে যেতে যেতে জোজো বলল, "আলিসাহেব, আপনি চার্লস শোভরাজের নাম শুনেছেন?"

আমজাদ আলি বললেন, "সে তো একজন মহাধুরন্ধর খুনি আর ঠকবাজ।"

জোজো বলল, "সেবারে আমরা গোয়ায় বেড়াতে গেছি, সন্ধেবেলা একটা রেস্টুরেন্টে গল্‌দা চিংড়ি খাচ্ছি। ওখানকার চিংড়ি খুব বিখ্যাত। একজন লোক আমাদের পাশের টেবিলে বসে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছিল, লোকটির যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনই শৌখিন পোশাক। দেখলে মনে হয় সাহেব, অথচ কথা বলছে হিন্দিতে, এক প্যাকেট তাস নিয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছে নানারকম।

"হঠাৎ কয়েকজন পুলিশ এসে রেস্টুরেন্টটা ঘিরে ধরল।

"কীসের জন্য তারা এসেছে তা তো আমরা জানি না। একজন পুলিশ অফিসার খুব ভদ্রভাবে বললেন, 'আপনাদের আমরা ডিসটার্ব করতে চাই না। শুধু এখানকার প্রত্যেকের নামগুলো লিখে নিয়ে যেতে চাই। আর কে কোন হোটেলে উঠেছেন। কেউ যদি পরিচয়পত্র দেখাতে পারেন, তবে তো ভালই। না হলে পরে আমরা গিয়ে দেখে আসব।'

"সবাই নাম বলছে, আর পুলিশরা একটা খাতায় লিখে নিচ্ছে। সকলে তো আর কোনওরকম আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। শুধু নাম, অনেকেইতো ইচ্ছে করলে অন্য নাম বলতে পারে, তাই না?"

আমজাদ আলি বললেন, "তা তো পারেই। হোটেলের নামও ভুল বলতে পারে।"

জোজো বলল, "আমি তখন বাবাকে বললাম, আমাদের পাশেই একটা বাজে গন্ধ পাচ্ছি। আগে তো এই গন্ধটা ছিল না! বাবা বললেন, ঠিক বলেছিস তো জোজো। একটা কিছু গণ্ডগোল আছে। বাবা তখন পুলিশ অফিসারটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বিশেষ কাউকে খুঁজছেন? আমি বোধ হয় আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রত্যেককে আর একবার বেশ জোরে জোরে নিজের নাম বলতে বলুন তো!

"পুলিশের অনুরোধে সবাই আবার নাম বলতে লাগল। আমাদের পাশের সেই সুন্দর চেহারার লোকটির নাম মোহন দারুয়ালা। সে যেই নিজের নাম বলল, অমনই তার গা থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ বেরুতে লাগল। আমি তখন লোকটার দিকে আঙুল দেখাতেই সে ফস করে একটা রিভলভার বার করে ফেলল। কিন্তু সেটা ওপরে তোলবার আগেই দু'জন পুলিশ জাপটে ধরল তাকে। তারপর তাকে সার্চ করে দেখা গেল, সে-ই পলাতক আসামি চার্লস শোভরাজ!"

আমজাদ আলি বললেন, "তুমিই চার্লস শোভরাজকে ধরিয়ে দিয়েছ! দারুণ ব্যাপার!"

জোজো বলল, "আমি যে মিথ্যে কথার গন্ধ পাই।"

সন্তু বলল, "গন্ধটা ঠিক কীরকম রে? আমরা তো নানারকম গন্ধ পাই, তার মধ্যে কোনটা মিথ্যে কথার গন্ধ বুঝব কী করে?"

জোজো বলল, "পচা মাছের গন্ধের সঙ্গে ভালুকের হিসির গন্ধ মিশলে যেমন হয়।"

সন্তু হঠাৎ হাসতে শুরু করে দিল।

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "হাসছিস যে? এতে হাসির কী আছে?"

সন্তু হাসতে হাসতেই বলল, "ভালুকের হিসির গন্ধ! চিনব কী করে? আমজাদসাহেব, আপনি চেনেন?"

আমজাদ আলি বললেন, "না, আমিও চিনি না! আমাদের এখানে ভালুক নেই।"

জোজো বলল, "আমরা যখন গাংরিপোতায় থাকতাম, সেখানে রাশি রাশি ভালুক। বেড়াল-কুকুরের মতন ঘুরে বেড়াত রাস্তা দিয়ে আর আমাদের বাংলোর পাশে হিসি করে যেত!"

সন্তু বলল, "এইবার আমি যেন সেই গন্ধটা পাচ্ছি!"

জিপটা এসে থামল বইয়ের দোকানের সামনে।

দোকানটা বেশ বড়ই। অনেকরকম গল্পের বই। স্কুল-কলেজের বই ছাড়াও কলম, পেনসিল, প্যাড সবই পাওয়া যায়।

ভেতরে বেশ কয়েকজন খদ্দের রয়েছে, তিন কর্মচারীও আছে। পেছন দিকে একটা টেবিল ও চেয়ার, সেখানে কেউ নেই।

আমজাদ আলি বললেন, "ওইখানে মালিক বসেন। কিন্তু এখন তো দেখছি না।"

সন্তু আর জোজো ঘুরে ঘুরে বই দেখতে লাগল। বাংলা বই আর কিছু ইংরেজি গল্পের বইও আছে। হ্যারি পটারের বইও এখানে পৌঁছে গেছে।

জোজো একটা বই খুলে নাকের কাছে নিয়ে বলল, "নতুন বইয়ের গন্ধ ভারী ভাল লাগে।"

আমজাদ আলি বললেন, "কিন্তু ভাই, সব গল্পের বইতেই তো অনেক মিথ্যে কথা থাকে।"

জোজো বলল, "মোটেই না। কোনও বইতেই মিথ্যে কথা থাকে না। যা থাকে, তাকে বলে কল্পনা। কল্পনা আর মিথ্যে কথা এক নয়।"

আমজাদ আলি বললেন, "তা ঠিক। তা ঠিক।"

সন্তু বলল, "জোজো যেমন মিথ্যে কথা বলে না, সবই ওর কল্পনা!"

আমজাদ আলি একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই, নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে দেখা হতে পারে কি? উনি কখন আসবেন?"

কর্মচারীটি এক কোণের একটা দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ওই ঘরে রয়েছেন। চলে যান!"

আমজাদ আলি ফিসফিস করে জোজোকে বললেন, "কী ছুতোয় দেখা করব? কিছু একটা মিথ্যে কথা তো বলতেই হবে।"

জোজো বলল, "আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি ম্যানেজ করব।"

কোণের দরজাটা ঠেলে একটু ফাঁক করে জোজো জিজ্ঞেস করল, "ভেতরে আসতে পারি?"

সেখানে আর একটা ছোট ঘর। একটা টেবিলে অনেকখানি ঝুঁকে একজন লোক কী যেন লিখছে মন দিয়ে। লোকটি মাঝবয়েসি, নাকের নীচে মোটা গোঁফ, মাথার মাঝখানে অল্প একটু টাক। ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি পরা।

লোকটি মুখ তুলে বলল, "কী চাই?"

জোজো বলল, "আপনি কি নীলকণ্ঠবাবু?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, আমি নীলকণ্ঠ মজুমদার।"

জোজো সন্তুর দিকে তাকিয়ে একদিনের ভুরু কাঁপাল। তার ঠিক মানে সন্তু বুঝল না। ঘরে কোনও গন্ধও সে পেল না।

ভেতরে এসে জোজো বলল, "অনির্বাণ সরকার আমাদের পাঠিয়েছেন। আপনি তাঁর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই ?"

নীলকণ্ঠ মজুমদার বলল, "অনির্বাণ সরকার, মানে, লেখক ? তাঁর তো অনেক বই আমার দোকান থেকে বিক্রি হয়।"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, আমরা রিপোর্ট পেয়েছি, উত্তরবঙ্গেই তাঁর বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। তার বেশিরভাগই আপনার দোকান থেকে। তাই তিনি আপনার কাছে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।"

নীলকণ্ঠ মজুমদার কৌতুহলী চোখে বললেন, "অত বড় নামকরা লেখক, আমার কাছে প্রস্তাব পাঠাবেন ? কী ব্যাপার শুনি ?"

জোজো বলল, "ব্যাপারটা এখনও গোপন। অনেকেই জানে না। অনির্বাণ সরকার ঠিক করেছেন, তিনি তাঁর বই আর কোনও পাবলিশারকে দেবেন না। এখন থেকে তাঁর সব বই নিজেই প্রকাশ করবেন। তিনি উত্তরবাংলার বিক্রির সব দায়িত্ব আপনাকে দিতে চান।"

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আমজাদ আলি বললেন, "আপনি কমিশন অনেক বেশি পাবেন।"

নীলকণ্ঠ মজুমদার ফাঁকা চেয়ার দেখিয়ে বলল, "আপনারা বসুন। এ তো খুব ভাল প্রস্তাব।"

জোজো বলল, "তিনি নিজেও উত্তরবঙ্গে একবার আসতে চান। আপনার দোকানে বসে পাঠকদের জন্য বই সই করবেন।"

সন্তু বলল, "এখানে ওঁর একজন বন্ধু আছে। শঙ্কর রায়বর্মন।"

নীলকণ্ঠ মজুমদার বলল, "শঙ্কর রায়বর্মন ? সে আবার কে ?"

সন্তু বলল, "আপনি তাঁর নাম শোনেননি। তিনি তো এখানকার রাজা। অনির্বাণ সরকারের পরের উপন্যাসটা শঙ্কর রায়বর্মনকে নিয়েই তো লেখা হচ্ছে।"

নীলকণ্ঠ মজুমদার বলল, "তাই নাকি ? এখানকার রাজা ? আজকাল অনেকেই নিজেদের রাজা বলতে শুরু করেছে!"

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "অনির্বাণ সরকার একবার আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটা বোধ হয় এই আলমারিতে আছে।"

দেওয়ালের গায়ে একটা আলমারি খুলে চিঠির বদলে টপ করে টেনে বার করল একটা অদ্ভুত ধরনের অস্ত্র।

ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, "অনির্বাণ সরকার পাঠিয়েছে ? অনির্বাণ সরকার মারা গেছে এক বছর আগে। শঙ্কর রায়বর্মন তার বন্ধু ? ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি! তোমরা নিজেরা এসে ফাঁদে পা দিয়েছ!"

সন্তু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার একটা চেয়ারে বসে পড়ে হেসে বলল, "আপনার কাছেও একটা এ কে ফরটি সেভেন আছে দেখছি! বইয়ের দোকানে অস্ত্র ? কিন্তু ওটা দিয়ে তো আমাদের ভয় দেখাতে পারবেন না। আমি জানি, ওটাতে গুলি নেই।"

নীলকণ্ঠ মজুমদার বলল, "গুলি নেই ? দেখবে তোমাদের ঝাঁঝরা করে দেব ?"

সন্তু বলল, "গুলি থাকলেও তা পারতেন না। দিনের বেলা, দোকানে কত লোক, রাস্তায় কত লোক, প্রচণ্ড শব্দ হবে, আপনি পালাবেন কী করে ?"

নীলকণ্ঠ মজুমদার বলল, "সে চিন্তা তোমায় করতে হবে না। এই লোকটা তো আমজাদ আলি, তাই না ? ওকে আমাদের দরকার ছিল!"

হাতের বড় অস্ত্রটা নামিয়ে রেখে তিনি ড্রয়ার থেকে বার করলেন একটা লম্বা ধরনের রিভলভার।

সেটা তুলে বলল, "আগেরটা দেখে ভয় পাওনি, এটা সম্পর্কে কিন্তু ভুল কোরো না। এতে সত্যি গুলি আছে, আর সাইলেন্সার লাগানো। কোনও শব্দ হবে না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ? আপনি কি সত্যিই নীলকণ্ঠ মজুমদার ?"

লোকটি বলল, "আমি আপাতত তোমাদের যম। এ আমজাদ আলিকে আজ রাত্তিরের মধ্যেই খতম করে দেওয়ার কথা ছিল, ও একজন সাক্ষী। ওকে এখানেই শেষ করব।"

জোজো বলল, "আমরা কিন্তু শঙ্কর রায়বর্মনের লোক!"

লোকটি হেসে বলল, "তাই নাকি ? তা হলে আমি কার লোক ? আমি আমার নিজেরই লোক। তোমরা সরে দাঁড়াও!"

আমজাদ আলির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সন্তু আর জোজো একসঙ্গে উঠে এসে আমজাদ আলিকে আড়াল করে দাঁড়াল।

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "বললাম, সরে দাঁড়াও। আমরা ছোট ছেলেদের মারি না!"

জোজো বলল, "ছোট মানে ? আমরা মোটেই ছোট নই, কলেজে পড়ি।"

সন্তু বলল, "আমাদের না মেরে কিছুতেই ওঁকে মারতে পারবেন না।"

লোকটি বলল, "আমি ঠিক তিন গুনব। এক... দুই..."

তক্ষুনি দরজাটা খুলে গেল।

॥ ৯ ॥

দুপুরবেলা খেতে দেওয়া হল দু'খানা করে মোটাসোটা রুটি, আর খানিকটা বেগুন পোড়া।

গৌতমকাকু বললেন, "এরা কি রোজ নিরামিষ খায় ? চেহারাগুলো তো ভালই দেখছি।"

কাকাবাবু বললেন, "নিজেরা মাছ-মাংস খায় বোধ হয়। আমরা তো বন্দি, আমাদের তা দেবে কেন ?"

গৌতমকাকু বললেন, "নিরামিষ খাওয়া অবশ্য ভালই। বেগুন পোড়াটার স্বাদ চমৎকার হয়েছে। আর একখানা রুটি পেলে বেশ হত। এখনও একটু খিদে রয়ে গেছে।"

দূরে একজনকে দেখে হেঁকে বললেন, "এই যে ভাই, শোনো, আর একখানা রুটি পেতে পারি কি ?"

লোকটি দু'দিকে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

গৌতমকাকু বললেন, "এরা তো ভারী চশমখোর। কুড়ি লাখ, পঞ্চাশ লাখ টাকা করে মুক্তিপণ চাইছে, অথচ ভাল করে খেতেও দেবে না!"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "গোবর্ধন, তুই কি ভাবছিস; এরা আমাদের হোটেলে রেখেছে ? এদের কোনও দয়ামায়া নেই।"

গৌতমকাকু বললেন, "ওদিকে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে। মিলি নিশ্চয়ই কেঁদে ভাসাচ্ছে। ছেলেটাও ঘাবড়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু ওদের সঙ্গে আছে। সন্তু কিছুটা সামলাবে।"

একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মহাদেবী। তার মাথায় একটা পালকের মুকুট, হাতে একটা খোলা তলোয়ার। বেশ দেখাচ্ছে ভালই।

সে কাছে এসে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনারা আরও রুটি চাইছিলেন ? লজ্জা করে না ? এ কি মামাবাড়ির আবদার পেয়েছেন ? এখানে কি আমাদের অফুরন্ত খাবার আছে ? চারখানা রুটি খেলে যথেষ্ট পেট ভরে যায়।"

গৌতমকাকু বললেন, "চারখানা! আমাদের তো মোটে দু'খানা করে রুটি খেতে দেওয়া হয়েছে!"

মহাদেবী ভুরু কুঁচকে বলল, "দু'খানা ? সত্যি কথা বলছেন ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমার এই বন্ধুটি আমেরিকায় বহু টাকা রোজগার করে। সে মাত্র দু'খানা রুটির জন্য মিথ্যে কথা বলবে ?"

মহাদেবী বলল, "চারখানা করে রুটি দেওয়ার কথা। শম্ভুটা নিশ্চয়ই চুরি করেছে। সঙ্গে আর কী দিয়েছিল?"

"বেগুনপোড়া।"

"ডিমসেদ্ধ দেয়নি?"

"না।"

"বন মুরগির ডিম পাওয়া গেছে অনেক। শম্ভু তার থেকেও সরিয়েছে। এই তোরা শম্ভুকে এখানে ধরে নিয়ে আয় তো!"

কাকাবাবুদের দিকে ফিরে সে আবার বলল, "আই অ্যাম সরি। আমরা খুব একটা ভাল খাবার দিতে পারি না, তা বলে বন্দিদের আধ পেটা খাইয়েও রাখতে চাই না। এবার দেখুন, আমরা চোরদের কীরকম শাস্তি দিই!"

কয়েকজন লোক টানতে টানতে নিয়ে এল শম্ভুকে। সে শুধু লুঙ্গির ওপর একটা গেঞ্জি পরে আছে। গেঞ্জিতে হলুদের দাগ।

একজন তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মহাদেবীর পায়ের কাছে।

মহাদেবী তার বুকের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, "এই হারামজাদা, তুই কবে থেকে রুটি চুরি করছিস?"

শম্ভু হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি কিছু করিনি। আমি কিছু করিনি।"

মহাদেবী বলল, "বাকি রুটি কোথায় গেল? এঁদের ডিম দিসনি কেন?"

অন্য লোকদের মধ্যে কয়েকজন বলল, "আমরাও আজ ডিম পাইনি।" দু'জন বলল, "আমাদের মাত্র তিনখানা করে রুটি দিয়েছে।"

মহাদেবী বলল, "আজ কুড়িটা ডিম রান্না হয়েছে। আমায় দুটো দিয়েছিল, একটা ফেরত দিয়েছি। তোমাদের রাজা ডিমই খান না। তা হলে কেন সবাই পাবে না? তুই বাকি ডিম বিক্রি করে দিস?"

শম্ভু বলল, "আমি কিছু করি না। নিতাই আমার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে যায়।"

দলের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলল, "না, না, না, ও আমার নামে মিথ্যে কথা বলছে!"

মহাদেবী মুখ তুলে বলল, "নিতাই, এদিকে আয়!"

অন্যরা এবার টেনে এনে নিতাইকেও ফেলে দিল মহাদেবীর পায়ের কাছে। শম্ভুর তুলনায় নিতাই বেশ গাঁট্টাগোট্টা, ধুতির ওপরে সে একটা খদ্দরের কোট পরে আছে।

মহাদেবী এবার বক্তৃতার ঢঙে বলতে লাগল, "আমরা এখানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব, তোমরা সবাই তার সৈনিক। আমাদের রাজ্যে কেউ চুরি করবে না, কেউ মিথ্যে কথা বলবে না, কেউ অন্যকে ঠকাবে না। এখন থেকেই সেই শিক্ষা নিতে হবে। নিতাই, তুমি জানো, শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। তুমি এখন যত বেশি মিথ্যে কথা বলবে, তত তোমার শাস্তি বাড়বে। তুমি একজন অত্যন্ত সাহসী সৈনিক, রাজা তোমার ওপরে অনেকখানি নির্ভর করেন। তোমাকে আমি প্রাণদণ্ড দিতে চাই না। কী অন্যায় করেছ, খুলে বলো!"

নিতাই কিন্তু শম্ভুর মতন কাঁদেনি। সে শান্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ, মহাদেবী, আমি দোষ করেছি। আপনার যা শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়, দিন। আসল কথাটা হল, চারখানা রুটি খেয়েও আমার পেট ভরে না। গায়ে শক্তি পাই না। তাই শম্ভুর কাছ থেকে আমি জোর করে, ভয় দেখিয়ে বেশি রুটি নিই।"

"ক'খানা রুটি খেলে তোমার পেট ভরে?"

"অন্তত দশ-বারোখানা?"

"ক'টা ডিম?"

"যত দেবেন। কুড়িটা ডিম আমি একাই খেয়ে হজম করতে পারি।"

"অন্যরা কেউ খাবে না। তুমি একাই সব খাবে?"

"সেটাই আমার অপরাধ হয়েছে। ভবিষ্যতে আর কোনওদিন এরকম করব না। আর যদি আমাকে মেরে ফেলতে চান, আমি ঘাড় পেতে দিচ্ছি।"

নিতাই মহাদেবীর পায়ের কাছে মাথাটা নুইয়ে রাখল।

মহাদেবী বলল, "সব মানুষের খিদে সমান হয় না। কেউ বেশি খায়, কেউ কম খায়। তোমাদের রাজা যেমন খুবই কম খাওয়া পছন্দ করেন। এখানে নিশ্চয়ই আরও অনেকের চারখানা রুটিতে পেট ভরে না। তার মানে, আমাদের খাদ্য বাড়াতে হবে। নিতাই, তুমি দশখানা রুটিই পাবে। আর অন্যরা, কার ক'খানা রুটি লাগবে, আজই জানিয়ে দাও। নিতাই, তুমি সত্যি কথা বলেছ তাই তোমার শাস্তি মকুব করা হল। কিন্তু শম্ভুকে ক্ষমা করা হবে না। সে-ই আসল দোষী। সে কেন নিতাইকে ভয় পাবে, সে কেন সব কথা আগেই আমাকে কিংবা রাজাকে জানায়নি ? রাজা যদি রাজ্যের সব কথা না জানে, তা হলে সে কীসের রাজা ? চুরি করা ডিম-রুটি শম্ভুও নিশ্চয়ই খায়, কিন্তু সে কথা সে বলেনি। তা হলে কি শম্ভুর একটা হাত কেটে নেওয়া হবে ?"

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

মহাদেবী হুকুম করল, "শম্ভু, ডান হাতটা মাটিতে পেতে রাখো!"

সে তলোয়ার তুলতেই গৌতমকাকু বললেন, "আরে আরে, সত্যি লোকটার হাত কেটে ফেলা হবে নাকি ? সামান্য অপরাধে এমন শাস্তি ? ওকে মাফ করে দিন!"

শঙ্কর রায়বর্মন কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, বোঝা যায়নি। এবার সে বলল, "ইউ প্লিজ শাট আপ! আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে অন্য শাস্তি দিন। হাত কেটে ফেলাটা বর্বর ব্যাপার!"

শঙ্কর রায়বর্মন আবার বলল, "বলছি না, শাট আপ!"

মহাদেবী শঙ্কর রায়বর্মনের দিকে ফিরে বলল, "কী রাজা, এর শাস্তি ঠিক আছে ? তুমি কাটবে, না আমি কাটব ?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "প্রথম অপরাধের জন্য ওর শাস্তিটা একটু কমিয়ে দিতে পারো। পুরো হাতটা কাটার বদলে ডান হাতের কড়ে আঙুলটা কেটে দাও!"

শম্ভু এবার বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বলল, "আমার অপরাধের জন্য এত কম শাস্তি দিচ্ছেন, এজন্য আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আর কখনও লোভ করব না। শুধু আর একটু যদি দয়া করেন, ডান হাতের বদলে বাঁ হাতের একটা আঙুল নিয়ে নিন।"

মহাদেবী বলল, "বেশ, তাই হোক।"

নিতাই মাথা তুলে বলল, "মহাদেবী, শম্ভুর বদলে আমার আঙুল কাটুন। শম্ভু রোগা দুবলা লোক, আমার একটা আঙুল গেলে কোনও ক্ষতি হবে না।"

শম্ভু জোর দিয়ে বলল, "না, না, আমার পাপের শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। সারাজীবন আমি কাটা আঙুলটার দিকে তাকিয়ে ভাবব, আমি মহাদেবীর কাছে মিথ্যে কথা বলেছি। আর বলব না।"

এবার অন্য একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল, "মহাদেবী, ওদের দু'জনকে ছেড়ে দিন, শাস্তি দিন আমাকে।"

মহাদেবী বলল, "কেন ?"

ছেলেটি বলল, "ওই শম্ভু আমার কাকা। ছেলেবেলায় আমার বাবা মারা গেছেন, উনি আমাকে নিজের ছেলের মতন মানুষ করেছেন। কাকার বদলে আমার একটা আঙুল নিন। আমিও দু'-একদিন চুরি করা ডিম খেয়েছি।"

মহাদেবী বলল, "তা হলে তো দেখছি তিনজনেরই আঙুল কাটতে হয়। আমাদের দলে এত আঙুল-কাটা সৈন্য থাকলে তো চলবে না। তোমাদের আরও অনেক লড়াই করতে হবে। শম্ভুকেই একা শাস্তি দেব। শম্ভু, মাটিতে হাত পাতো।"

শম্ভু বাঁ হাতটা মাটির ওপর পাততেই মহাদেবী তার কড়ে আঙুলে তলোয়ারটা রেখে চাপ দিল। চামড়া কেটে বেরোতে লাগল রক্ত।

শঙ্কু একটুও মুখ বিকৃত করল না, ব্যথার শব্দও করল না।

মহাদেবী নরম গলায় বলল, "ওরে, তোদের শাস্তি দিতে কি আমার ভাল লাগে ? তোরা তো সবাই আমার ভাইয়ের মতন। স্বাধীন রাজ্য পাওয়ার পর তোরাই তো সেটা চালাবি।"

তলোয়ারটা তুলে নিয়ে সে আবার বলল, "রক্ত বেরিয়েছে, তাই যথেষ্ট। আঙুলটা আর কাটলাম না।"

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "জয় জয় মহাদেবী! জয় জয় রাজা!"

মহাদেবী কাকাবাবুদের দিকে ফিরে বলল, "আমরা কিন্তু বন্দিদের প্রতি একটুও দয়ামায়া দেখাই না। এক কোপে হাত কেটে উড়িয়ে দিই!"

শঙ্কর রায়বর্মন এগিয়ে এসে বলল, "সবাই শোনো, একটা ঘোষণা আছে। তোমরা জানো যে, একটা বন্দি-মুক্তিপণের টাকা পাওয়া গেছে। এই দু'জনের জন্যও টাকা পাবই। এর বেশিরভাগ টাকাই অস্ত্র কেনার জন্য খরচ হবে। তবে তোমরা সবাই একপ্রস্থ নতুন জামাকাপড় পাবে। খাবারদাবারও বাড়িয়ে দেওয়া হবে আজ থেকে।"

সবাই আবার চেঁচিয়ে উঠল, "জয় জয় রাজা, জয় জয় মহাদেবী!"

শঙ্কর রায়বর্মন তারপর বলল, "শঙ্কু, যাও, বন্দিদের জন্য আরও রুটি আর ডিমসেদ্ধ নিয়ে এসো!"

কাকাবাবু বললেন, "না থাক। যা কাণ্ড হল, এর পর আর এখন আমাদের কিছু খাওয়ার রুচি নেই।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "ঠিক আছে, এবারে চলুন আমার সঙ্গে।"

মহাদেবীকে সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে ? আমরা রাজপুরীতে যাচ্ছি।"

মহাদেবী বলল, "না, তুমি যাও, আমার অন্য কাজ আছে।"

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে সে মুচকি হেসে বলল, "এবার পালাবার চেষ্টা করবেন নাকি ? করে দেখুন না! আমাকে বাজিটা জিতিয়ে দিন।"

কাকাবাবু বললেন, "কী বাজি, তা তো এখনও শুনিনি। শুনলে না হয় চেষ্টা করা যেত।"

মহাদেবী বলল, "সেটা জানানো হবে না!"

শঙ্কর রায়বর্মন ওঁদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে। আজ আর চোখ বাঁধেনি।

ক্রাচ বগলে নিয়ে ঝোপ ঠেলে যেতে কাকাবাবুর অসুবিধে হচ্ছে। কোনও কোনও গাছে বেশ কাঁটা আছে। আবার ভারী সুন্দর দেখতে ফুলও ফুটে আছে অনেক। মাথার ওপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে টিয়াপাখির ঝাঁক।

খানিকটা দূরে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে জিপগাড়িটা।

সেটাতে ওঠার পর শঙ্কর রায়বর্মন নিজে বসল ড্রাইভারের জায়গায়। তার পাশে একজন মাত্র গার্ড, তার হাতে একটা বর্শা।

জিপটা চালাতে চালাতে শঙ্কর রায়বর্মন গৌতমকাকুকে বলল, "আপনার স্ত্রী কুড়ি লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি হয়েছেন। তবে শর্ত দিয়েছেন, ওই টাকায় দু'জনকেই ছেড়ে দিতে হবে। আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। খবর পাঠিয়েছি, সত্তর লাখ থেকে বড় জোর পাঁচ লাখ কমাতে পারি।"

গৌতমকাকু বললেন, "মিলি অত টাকা পাবে কোথায় ?"

কাকাবাবু হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, "গৌতম, মিলিকে চিঠি লিখে দে, আমার জন্য যেন এক পয়সাও না দেয়। তোকে টাকা দিয়ে ছাড়াতে চায় তো ছাড়াক!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "বেশ তো, পঁয়তাল্লিশ লাখ পাঠাতে বলুন, আমেরিকান বাবুটিকে ছেড়ে দেব। রাজা রায়চৌধুরী এখানে থাকবেন।"

গৌতমকাকু বললেন, "পঁয়তাল্লিশ লাখ! জোগাড় করা অসম্ভব ব্যাপার!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "গয়না বিক্রি করতে বলুন। আপনার স্ত্রীর নিশ্চয়ই অনেক গয়না আছে। ডাক্তারের বউদের খুব গয়না থাকে।"

গৌতমকাকু বললেন, "আমেরিকায় মেয়েরা বেশি গয়না পরে না।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আমেরিকায় বড়লোকের বউরা দামি দামি হিরের গয়না পরে না? আমাকে আমেরিকা শেখাচ্ছেন? সেসব এক-একটা গয়নারই দাম পঁচিশ-তিরিশ লাখ টাকা!"

গৌতমকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কখনও আমেরিকায় ছিলেন?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "ছিলাম তো। অন্তত সাত-আট বছর।"

"ফিরে এলেন কেন?"

"নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে। এখানে স্বাধীনভাবে থাকব। আমেরিকায় গোলামি করতে যাব কেন?"

"ওদেশ ছেড়ে এসে এরকম বনজঙ্গলের মধ্যে থাকা, সত্যি আপনার দারুণ জেদ আছে, স্বীকার করতেই হবে। তবে, আমাদের মতন কয়েকজনকে ধরে টাকা আদায় করে কত টাকাই বা তুলতে পারবেন! তাতে কি একটা রাজ্য পাওয়া যায়?"

"সে-ব্যাপারে আমার নিজস্ব প্ল্যান আছে। আপনাদের ধরে রাখতে হচ্ছে, এমনি এমনি চাইলে কি টাকা দিতেন?"

"সে আপনার যাই-ই প্ল্যান থাক। একটা কথা জেনে রাখুন, আমার এই বন্ধুকে ছেড়ে আমি কিছুতেই একা মুক্তি পেতে চাই না। আমাদের যত বেশিদিন ধরে রাখবেন, ততই আপনার বিপদ বাড়বে।"

এ-কথার উত্তর না দিয়ে শঙ্কর রায়বর্মন হা-হা করে হেসে উঠল।

আরও কিছুক্ষণ পরে জিপটা থামল এক জায়গায়।

বিকেল হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘ জমেছে বেশ। যে-কোনও সময় বৃষ্টি হতে পারে।

এখানেও জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা জায়গা ফাঁকা। দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ভাঙা ঘরবাড়ি। অনেককালের পুরনো, প্রায় ধ্বংসস্তূপ বলা যায়, প্রায় কোনও ঘরেরই ছাদ আস্ত নেই। একপাশে একটা মন্দিরও আছে, সেটা একটা অশ্বত্থ গাছের মোটা মোটা শেকড়ে ঢাকা।

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "এইখানে ছিল আমাদের বংশের রাজধানী। এটা আবার নতুন করে গড়া হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে একসময় কিছু লোকজনের বসতি ছিল বোঝা যাচ্ছে। হয়তো তখন এত ঘন জঙ্গল ছিল না। এককালে এখানে অনেক ছোট ছোট জমিদারি ছিল, তারা নিজেদের বলত রাজা। কিন্তু এটা যে আপনাদেরই ছিল, তা বোঝা যাবে কী করে?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আমার কাছে দলিল আছে এ জায়গার। বংশলতিকা করা আছে। আমিই শেষ উত্তরাধিকারী।"

কাকাবাবু বললেন, "সেসব দলিল দেখিয়ে কি পুরনো জমিদারি ফেরত পাওয়া যায়? জমিদারি প্রথাই তো উঠে গেছে।"

শঙ্কর রায়বর্মন সগর্বে বলল, "জমিদারি নয়, স্বাধীন রাজ্য। ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছিল। এখন ভারত সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নেব।"

এক জায়গায় অনেকখানি পাথরের বাঁধানো চাতাল, তার এক পাশে কয়েকটা ঘরের দেওয়াল।

কাকাবাবু কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে সেই চাতালে উঠে দেওয়ালের ইট পরীক্ষা করে বললেন, "মনে হচ্ছে, প্রায় দু'শো বছরের পুরনো।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "ভেতরে যাবেন না। ওখানে দুটো ময়াল সাপ থাকে। ওরা অবশ্য আমাকে কিছু বলে না, কিন্তু বাইরের লোক দেখলে তাড়া করে।"

গৌতমকাকু বললেন, "সাপও মানুষ চেনে বুঝি?"

কাকাবাবু চাতালের অন্য একদিকে গিয়ে বললেন, "এর মধ্যে এটা নতুন করে গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে ?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "না, এখনও শুরু হয়নি। নকশা তৈরি হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে যে দেখছি, এখানে একটা জায়গা নতুন করে খোঁড়া হয়েছে।"

শঙ্কর রায়বর্মন কাকাবাবুর কাছে গিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "তাই তো, এটা তো আগে ছিল না।"

গার্ডকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "মাল্লু, এখানে কে খুঁড়েছে ?"

মাল্লু বলল, "জানি না তো স্যার। আগে দেখিনি।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আমি দিনসাতেক আগে এসেছিলাম, তখন গর্ত ছিল না। আমার এলাকার মধ্যে আমাকে না জানিয়ে কে এসে গর্ত খুঁড়বে ?"

কাছে গিয়ে দেখা গেল, শুধু এক জায়গায় গর্ত নয়। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে লম্বা একটা নালার মতন কাটা হয়েছে। কোথাও-কোথাও সেটার ওপর আবার মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও পুরোপুরি ভরেনি।

কাকাবাবু এক জায়গায় বসে পড়ে সেই নালার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন।

তারপর মুখ তুলে বললেন, "মোটা মোটা তার রয়েছে এর ভেতরে।"

গৌতমকাকু বললেন, "এখানে কেউ ইলেকট্রিকের লাইন টানছে ?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "এই জঙ্গলে কে ইলেকট্রিক আনবে ? প্রথমত, সেটা বেআইনি। তা ছাড়া কোনও লোক ভয়ে এখানে আসে না।"

কাকাবাবু সেই নালার ধার দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

সেটা চলেছে তো চলেইছে। এক-এক জায়গায় গাছপালা কেটে খোঁড়া হয়েছে সেই নালা।

প্রায় পনেরো মিনিট যাওয়ার পর কাকাবাবু হাত তুলে অন্যদের থামতে বললেন।

এখানেও খানিকটা ফাঁকা জায়গায় রয়েছে দু'খানা তাঁবু। ছোট ছোট গাছের ডাল কেটে সেই তাঁবুর ওপর এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দূর থেকে ঠিক বোঝা যাবে না।

গৌতমকাকু বললেন, "এখানে আর্মি ক্যাম্প করেছে ?"

শঙ্কর রায়বর্মন প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, "হতেই পারে না। আর্মি মুভমেন্টের খবর আমি সবসময় পাই। আর্মির মধ্যেও আমাদের বংশের লোক আছে। তা ছাড়া, আর্মি ক্যাম্প করতে গেলে আগে রাস্তা বানাবে। এখানে কোনও রাস্তা নেই। গাড়িও নেই।"

গৌতমকাকু বললেন, "যদি কমান্ডো হয় ? একটা তাঁবুর পাশে কয়েকটা সাইকেল রয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "জঙ্গলের মধ্যে নিঃশব্দে চলাফেরার সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে সাইকেল। তাঁবু যখন আছে, তখন মানুষও আছে নিশ্চয়ই। তাদের চেহারাটা দেখা দরকার। আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

এর মধ্যে বৃষ্টি নেমে গেল ঝিরঝির করে।

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "এখানে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে ? আমার ডেরায় ফিরে যেতে হবে। আমার লোকজনদের ডেকে এনে এসব তাঁবু ফাঁবু ভেঙে উড়িয়ে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের কাছে কী ধরনের অস্ত্র আছে, তা জানতে হবে না ? আপনার তো সম্বল দুটো-একটা রিভলভার। বড় বড় অস্ত্রগুলোর গুলিই নেই।"

"আমার কুড়িজন লোক এনে একসঙ্গে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

"ওদের যদি একটা লাইট মেশিনগান থাকে, তা হলে সেটার সামনে কুড়িজন লোক পোকামাকড়ের মতন শেষ হয়ে যাবে। তার আগে জানতে হবে, ওরা কারা ? যদি আমাদের দেশের আর্মি হয়, তাদের সঙ্গে লড়াই করার প্রশ্নই ওঠে না।"

"আমার এলাকার মধ্যে আমি আর্মিকেও আসতে দেব না! আমি এখানকার রাজা।"

"আপনার রাজত্বটা আগে স্বাধীন হোক! এখনও তো হয়নি।"

গৌতমকাকু বললেন, "এখানে বৃষ্টির মধ্যে কতক্ষণ ভিজব ? শীত করছে!"

কাকাবাবু বললেন, "ভিজতেই হবে। আমার যেটা সন্দেহ হচ্ছে, সেটা সত্যি কিনা জানা দরকার।"

মান্নু বলল, "স্যার, আমি চুপি চুপি পেছন দিক দিয়ে গিয়ে দেখে আসব!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "যা তো, দেখে আয়।"

কাকাবাবু বললেন, "না, তুমি একা যাবে না।"

ঠিক তখনই দুটো লোক একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে দৌড়ে অন্য তাঁবুটাতে ঢুকে গেল।

লোকদুটো কালো রঙের টাইট প্যান্ট পরা, কালো জামা, মুখেও কালো মুখোশ। শুধু নাক আর চোখ দুটো খোলা আছে।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "ব্ল্যাক প্যান্থার! আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।"

গৌতমকাকু বললেন, "ব্ল্যাক প্যান্থার মানে ?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুদিন আগেই একটা গোপন রিপোর্ট এসেছিল, কোনও শত্রু-দেশ থেকে এই ব্ল্যাক প্যান্থার বাহিনীকে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্যারাশুটে নামিয়ে দেবে। তারপর তারা আমাদের এয়ারপোর্ট, রেল স্টেশন ধ্বংস করবে। গত বছর আমি এরকম একটা দলকে ধরে ফেলেছিলাম। এবার আবার শুরু করেছে। মাটি খুঁড়ে যে তার টেনে নিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই সেরকম কোনও উদ্দেশ্য আছে। এদিকে কোথাও এয়ার ফোর্সের বেস আছে।"

গৌতমকাকু বললেন, "কিন্তু দুটো তাঁবুতে আর কত লোক থাকবে! আমাদের পুলিশ বা আর্মি খবর পেয়ে গেলে ওরা নিজের দেশে পালাবে কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা পালাতে চায় না। এখন সব সুইসাইড স্কোয়াড শুরু হয়েছে জানিস না ? ওরা মরবে জেনেই এসেছে। তাই সাঙ্ঘাতিক বেপরোয়া হতে পারে।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "ধুত! ব্ল্যাক প্যান্থার না ছাই! এমনি কোনও ডাকাতের দল কালো পোশাক পরে ভড়কি দিচ্ছে। ওরা বোধ হয় জানে না যে, আমার এলাকায় ঢুকে পড়েছে। আমার নাম শুনলেই ওরা ভয় পাবে! মান্নু, তুই যা তো, জিজ্ঞেস করে আয়, এখানে কেন তাঁবু গেড়েছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "শাট আপ! আমার হুকুমের ওপর কথা বলবেন না। আর একবার মুখ খুললেই একটা থাপ্পড় কষাব!'

তারপর এক পা এগোতে গিয়ে একটা লতায় পা জড়িয়ে ঘুরে পড়ে যেতে লাগল সে। কোনওক্রমে একটা গাছের সরু ডাল ধরল, সে ডালটাও ভেঙে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর আড়াল থেকে সামনে এসে একজন ব্ল্যাক প্যান্থার এল এম জি থেকে গুলি চালাল। একঝাঁক গুলি।

কাকাবাবু তাঁর বন্ধুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে শুয়ে পড়লেন মাটিতে।

বিরাট জোরে মেঘ ডেকে উঠল, হয়তো বাজ পড়ল কাছাকাছি। বৃষ্টিও পড়ছে প্রবল তোড়ে। বৃষ্টির জন্যই সব দিক অন্ধকার হয়ে গেছে।

একটু পরে মুখ তুলে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "গৌতম, তুই ঠিক আছিস ?"

গৌতমকাকু বললেন, "হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। কিন্তু শঙ্করের বোধ হয় গুলি লেগেছে। নড়ছেটড়ছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "এক্ষুনি এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ওরা নিশ্চয়ই খুঁজতে আসবে। আমি শঙ্করের একটা দিক ধরছি, তুই অন্য দিকটা ধরে ওকে টেনে নিয়ে চল।"

গৌতমকাকু বললেন, "ইস, এর বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে।"

দু'জনে মিলে প্রায় ছ্যাঁচড়াতে-ছ্যাঁচড়াতে শঙ্করকে নিয়ে দৌড়োলেন বনবাদাড় ঠেলে। এদিক-ওদিক তাকিয়েও ওঁরা মান্নুকে দেখতে পেলেন না।

কোনওরকমে ওঁরা পৌঁছে গেলেন জিপটার কাছে। কেউ তাড়া করে আসছে কিনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। শঙ্করকে তোলা হল জিপে।

কাকাবাবু বললেন, "আমি জিপটা চালাচ্ছি। গৌতম, তুই দ্যাখ এ-লোকটা বেঁচে আছে কি না। কিংবা যদি বাঁচানো যায়!"

॥ ১০ ॥

কাকাবাবু জঙ্গলের রাস্তাও চেনেন না, এখন আর কিছু দেখাও যাচ্ছে না। তবু কাকাবাবু এলোমেলোভাবে গাড়ি চালিয়ে জায়গাটা থেকে সরে যেতে চাইলেন।

খানিক বাদে জিপটা থামিয়ে কান পেতে শুনলেন। পেছনে কোনও শব্দ নেই, কেউ তাড়া করে আসছে না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "গৌতম, কী দেখলি? লোকটা বেঁচে আছে?"

গৌতমকাকু বললেন, "হ্যাঁ, বেঁচে আছে এখনও। বুকে লাগেনি, গুলি লেগেছে কাঁধে। প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে। রক্ত বন্ধ করতে না পারলে বাঁচানো যাবে না। জায়গাটা বাঁধব কী দিয়ে?"

কাকাবাবু ড্যাশবোর্ড খুলে দেখলেন, সেখানে একটা টর্চ রয়েছে। সেটা জ্বেলে গাড়িটার সব জায়গা দেখতে দেখতে পেছনের সিটের তলায় পেয়ে গেলেন একটা চৌকো বাক্স আর একটা পলিথিনের বালতি।

বাক্সটা খুলে তিনি বললেন, "লোকটার ভাগ্য ভাল, এটাতে ফার্স্ট এডের জিনিসপত্র রয়েছে। তুলো, গজ-ব্যান্ডেজ, বেঞ্জিন।"

গাড়ি থেকে নামিয়ে শঙ্কর রায়বর্মনকে শুইয়ে দেওয়া হল মাটিতে।

কাছেই জলের কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোনও ঝরনা বা ছোট নদী আছে।

গৌতমকাকু বললেন, "একটা গুলি গেঁথে আছে। ওটাকে এক্ষুনি বের করে ফেলা দরকার। রাজা, তুই এক কাজ কর, খানিকটা জল নিয়ে আয়। দেখি, কতটা কী করা যায়!"

কাকাবাবু জল আনার পর শঙ্কর রায়বর্মনের ক্ষতটা পরিষ্কার করতে করতে গৌতমকাকু বললেন, "ওরা গুলি চালিয়েই থেমে গেল, তেড়ে এল না কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "খুব সম্ভবত আমাদের দেখতে পায়নি, শুধু আওয়াজ শুনেছে। তা ছাড়া, এত বৃষ্টি, বৃষ্টিই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে বলতে পারিস।"

গৌতমকাকু জিজ্ঞেস করলেন,"তোর আর একটা ক্রাচ কোথায়? তুই একটা নিয়ে দৌড়োলি কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ফেলে এসেছি। দুটো থাকলে শঙ্করকে ধরতাম কী করে! একটা নিয়ে দৌড়োতে খুবই কষ্ট হয়, কিন্তু বিপদের সময় কষ্টের কথা মনে থাকে না।"

শঙ্কর রায়বর্মন অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। তার ক্ষতস্থানে খানিকটা বেঞ্জিন ছোঁয়াতেই সে যন্ত্রণায় উঃ আঃ করে ছটফটিয়ে উঠল।

ছোট ছেলেকে ধমক দেওয়ার মতন গৌতমকাকু বললেন, "চুপ করে শুয়ে থাকো। নড়াচড়া করবে না।"

সে ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই গৌতমকাকু আবার বকুনি দিয়ে বললেন, "বললাম না, ছটফট করবে না।"

কাকাবাবুও অন্যদিকে তাকিয়ে তাকে জোর করে চেপে ধরে রইলেন।

শঙ্কর রায়বর্মন চোখ মেলে জিজ্ঞেস করল, "আমার কী হয়েছে? আমি কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কাঁধে গুলি লেগেছে। আমরা তোমাকে নিয়ে কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি।"

গৌতমকাকু বললেন, "গুলিটা যদি আর একটু নীচে, তোমার বুকে লাগত, তা হলে আর কিছু করার থাকত না। আশা করি তোমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারব। তবে, বাঁ হাতটা অনেকদিন ব্যবহার করতে পারবে না।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শঙ্কর রায়বর্মন জিজ্ঞেস করল, "মাল্লু কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "জানি না। তাকে আর দেখতে পাইনি, দৌড়ে পালিয়েছে, না গুলি খেয়েছে, কে জানে! ওখানে ওকে দেখতে পাইনি।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "মাল্লু নেই। আমি গুলি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম, আপনারা সেই সুযোগে পালালেন না কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষকে বিপদে ফেলে পালাবার অভ্যেস আমাদের নেই।"

শঙ্কর রায়বর্মন আবার বলল, "গৌতমবাবু, আপনাদের আমি বন্দি করে এনেছি, চড় মেরেছি, তবুও আপনি আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন কেন ?"

গৌতমকাকু বললেন, "আমি ডাক্তার, আমাদের কাছে শত্রু-মিত্র কিছু নেই। যে-কোনও অসুস্থ লোককে চিকিৎসা করার শপথ নিতে হয় আমাদের। একটু ডান পাশে ফেরো তো!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আমার রিভলভারটা কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা আমার কাছে রেখেছি। ওরা তাড়া করে এলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হত তো!"

আবার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শঙ্কর রায়বর্মন আপন মনে বলতে লাগল, "আমার কাছে রিভলভার নেই, মাল্লু কোথায় কে জানে, এখন আপনারা প্রতিশোধ নিতে পারেন, আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারেন।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে পুলিশে ধরাবার ব্যাপারে আমাদের মাথাব্যথা নেই। তার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ আছে। আমাদের এক্ষুনি ওই তাঁবুর কাছে আর একবার ফিরে যেতে হবে।"

গৌতমকাকু দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "ওখানে ফিরে যেতে হবে ? কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "বিদেশি কমান্ডোরা এসে আমাদের এখানে গোপন ঘাঁটি গেড়েছে। তারা কী মতলবে এসেছে, কোথায় কী ধ্বংস করতে চায়, তা জানতে হবে না ?"

গৌতমকাকু বললেন, "আমরা কী করে জানব ? দেখলিই তো, ওদের কাছে লাইট মেশিনগান আছে, কাছে গেলে ঝাঁঝরা করে দেবে। বরং কাল সকাল পুলিশকে খবর দিলে, তারাই ব্যবস্থা করবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এইসব ব্যাপারে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না। যদি আজ রাত্তিরেই ওরা কিছু শুরু করে দেয় ? মাটি খুঁড়ে বহুদূর পর্যন্ত তার বসিয়েছে, নিশ্চয়ই কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা উড়িয়ে দিতে চায়। মনে কর, আজ রাত্তিরেই যদি ওরা একটা এয়ারপোর্ট ধ্বংস করে দিতে পারে, তা হলে কাল আমাদের আপশোষের শেষ থাকবে ? নিজেদেরই দায়ী মনে হবে না ?"

গৌতমকাকু বললেন, "কিন্তু আমরা তো হঠাৎ দেখে ফেলেছি। ভাঙা বাড়িটার কাছে যদি না যেতাম—"

কাকাবাবু বললেন, "একবার দেখে ফেললে আর দায়িত্ব এড়ানো যায় না। আমাকে যেতেই হবে।"

তারপর তিনি শঙ্কর রায়বর্মনের দিকে ফিরে বললেন, "শোনো শঙ্কর, তুমি তোমার এলাকা স্বাধীন রাজ্য করতে চাও, তা তুমি পারবে কি পারবে না, তা আমরা জানি না। সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু একটা কোনও বিদেশি শক্তি যদি আমাদের দেশের ক্ষতি করতে চায়, তখন তুমি কী করবে ? তাদের সাহায্য করবে ?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "মোটেই না। আমি তখন ভারতীয় হিসেবে লড়ব!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ! তা হলে এখন আমরা সবাই এক দলে!"

গৌতমকাকু বললেন, "কিন্তু রাজা, আমরা মাত্র তিনজন মিলে কী করে ওদের আটকাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "তিনজনও লাগবে না। আমি একাই যাব। তোরা দু'জন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করবি।"

গৌতমকাকু বললেন, "একা ? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমার মাথা যেমন ছিল তেমনই আছে। তোর কতদূর হল ?"

শঙ্কর রায়বর্মনের কাঁধ থেকে গুলিটা বার করে ফেলা হয়েছে। তুলো আর ওষুধ দিয়ে একটা ব্যান্ডেজও বেঁধে ফেলেছেন গৌতমকাকু। শঙ্কর রায়বর্মনের মাথায় হাত রেখে বললেন, "এ ছেলেটার মনের জোর আছে। ব্যথা লেগেছে খুবই, কিন্তু একটুও চ্যাঁচামেচি করেনি। কী, এখন উঠে দাঁড়াতে পারবে ?"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "পারব।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাই জিপে ওঠো। আমি চালাব। শঙ্কর, তুমি এ-জায়গাটা চিনতে পারছ ? ওই তাঁবুর দিকে ফেরার রাস্তা তুমি বলে দিতে পারবে তো ? একেবারে কাছে যেতে হবে না। খানিকটা দূরে নামব।"

শঙ্কর রায়বর্মনের নির্দেশ অনুযায়ী কিছুক্ষণ গাড়ি চালাবার পর সে বলল, "তাঁবু দুটো এরই কাছাকাছি থাকার কথা। কিন্তু আলোটালো তো জ্বলছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "বড় আলো জ্বালবে না। ঠিক আছে, তোমরা গাড়িতেই বোসো। আমি নেমে দেখছি।"

গৌতমকাকু কাকাবাবুর একটা হাত চেপে ধরে বললেন, "রাজা, তোকে আমি একা যেতে দেব না!"

কাকাবাবু বললেন, "এইসব জায়গায় অনেক লোকের বদলে একজনই যাওয়া সুবিধেজনক। তাতে লুকিয়ে থাকা যায়।"

গৌতমকাকু বললেন, "আমি তোর সঙ্গে যাব। এই বিপদের মধ্যে আমি তোকে কিছুতেই একা যেতে দেব না।"

কাকাবাবু বললেন, "শোন, আমার জীবনের কোনও দাম নেই। দেশের কাজের জন্য যদি আমি মরেও যাই, তাতে কিছু যায় আসে না। তোর বউ-ছেলে আছে, অনেক দায়িত্ব আছে, আমার সেসব কিছু নেই।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "তা হলে আমি যাব আপনার সঙ্গে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এই অবস্থায় যাবে কী করে ? তোমাকে নিয়েই আমি মুশকিলে পড়ব। শোনো, যা করবার খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে। তোমরা এখানে ঠিক আধঘণ্টা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। তার মধ্যে আমি ফিরবই। যদি না ফিরি, শঙ্কর, তুমি যেমন করেই হোক গৌতমকে কাছাকাছি কোনও থানায় পৌঁছে দেবে। গৌতম সব জানাবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে।"

একটামাত্র ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবু নেমে পড়লেন জিপ থেকে।

গাছের আড়াল দিয়ে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন তাঁবু দুটো। এর মধ্যে খানিকটা জ্যোৎস্না ফুটেছে। বৃষ্টি থেমে গেলেও এখনও মেঘ আছে আকাশে। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে চাঁদ।

এবার কাকাবাবু মাটিতে শুয়ে পড়ে বুকে হাঁটতে লাগলেন কচ্ছপের গতিতে। ছাত্র বয়েসে এন সি সি-তে এসব ট্রেনিং নিয়েছিলেন, এখন কাজে লেগে গেল।

আর একটু কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁবুর মধ্যে খুব মৃদু কোনও আলো জ্বলছে। একজন কালো পোশাক পরা লোক হাতে একটা স্টেনগান নিয়ে দুটো তাঁবুর চারপাশ ঘুরে আসছে।

সে চোখের আড়ালে গেলে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন কাকাবাবু। এইভাবে তিনি একটা তাঁবুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এই লোকটাই বোধ হয় আগে গুলি চালিয়েছে। কিন্তু এখন সে খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছে না, হাতের অস্ত্রটা নীচের দিকে করে হাঁটছে আর গুনগুন করে গান গাইছে।

লোকটি একবার কাকাবাবুর কাছাকাছি এসেও কিছু দেখতে পেল না। সে একটু এগিয়ে যেতেই কাকাবাবু এক লাফে গিয়ে হাতের ক্রাচ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারলেন তার মাথায়।

প্রায় কোনও শব্দই হল না, লোকটি ঝুপ করে পড়ে গেল। কাকাবাবু তার স্টেনগানটা তুলে নিলেন।

এই অস্ত্র তিনি আগে কখনও ব্যবহার করেননি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বুঝলেন, ব্যবহার করা এমন কিছু শক্ত নয়। অতি মারাত্মক অস্ত্র। বৃষ্টির মতন গুলি বেরোয়।

প্রথম তাঁবুটার একটা জানলা আছে। খুব সাবধানে সেখান দিয়ে উঁকি মেরে কাকাবাবু দেখলেন, কয়েকজন লোক মাটিতে শুয়ে কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আর দু'জন লোক মোমবাতি জ্বালিয়ে তাস খেলছে।

কাকাবাবু একবার ভাবলেন, জানলা দিয়ে বন্দুকটা গলিয়ে একবারেই সরক'টা লোককে মেরে ফেলা খুবই সহজ।

তারপরই মনে হল, শত্রুপক্ষ হোক আর যা-ই হোক, মানুষ তো। মানুষকে এমনভাবে মারা যায়?

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এদের যে কোনও দয়ামায়া নেই। এদের মাথার মধ্যে এমন সব ভুল শিক্ষা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও মেরে ফেলতে দ্বিধা করে না। এরা সুযোগ পেলে একসঙ্গে কয়েকশো বা কয়েক হাজার লোককেও মেরে ফেলতে পারে। এদের নিজেদেরও প্রাণের ভয় মুছে দেওয়া হয়েছে।

তবু কাকাবাবু গুলি চালালেন না।

অস্ত্রটা খুব ভারী, তাই দু'হাতে ধরতে হয়। ক্রাচটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু অন্য তাঁবুটার কাছে গেলেন। তার ভেতরটা একেবারে অন্ধকার। কাকাবাবু সেটার পেছন দিকে গিয়ে জানলায় টর্চ জ্বেলে দেখলেন, ভেতরে রয়েছে নানারকম বাক্স ও টিনের কৌটো। কোনও লোক নেই।

কাকাবাবু কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। ঢুকে পড়লেন সেই তাঁবুর মধ্যে।

টর্চ জ্বেলে দেখতে লাগলেন সেই বাক্স ও কৌটোগুলো। তাতে রয়েছে প্রচুর ডিনামাইট, বোমা ও অন্য সব মারাত্মক অস্ত্র। এতসব বিস্ফোরক দিয়ে অনেক সেতু, রেল স্টেশন, বিমানবন্দর উড়িয়ে দিতে পারে।

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মানুষ কত কষ্ট করে, কত টাকা খরচ করে এসব বানায়, আবার একদল মানুষই সেসব ধ্বংস করে। পৃথিবীতে সব দেশের মানুষ কি হিংসা ভুলে শান্তিতে থাকতে পারবে না কোনওদিন?

এক জায়গায় একটা পেট্রলের টিন দেখতে পেয়ে কাকাবাবু সেটা নিয়ে চলে এলেন বাইরে।

পাশের তাঁবুতে এখনও কোনও সাড়াশব্দ নেই। সেই কিছু টের পায়নি। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় কাকাবাবু হাতের ঘড়ি দেখলেন। এর মধ্যে কুড়ি মিনিট কেটে গেছে।

স্টেনগানটা নামিয়ে রেখে তিনি পেট্রল ছড়াতে লাগলেন দুই তাঁবুর মাঝখানের জায়গাটায়। একদিক থেকে আর একদিকে এসে প্রথম তাঁবুটার সামনে ঢেলে দিলেন বাকি সব পেট্রল।

তারপর তিনি ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলেন একজন লোক বেরিয়ে আসছে প্রথম তাঁবু থেকে। লোকটা হয়তো বাথরুমের জন্য বেরিয়েছিল, কাকাবাবু লুকোবার চেষ্টা করেও লুকোতে পারলেন না।

লোকটি একটা দুর্বোধ চিৎকার করে তেড়ে এসে কাকাবাবুর গলা চেপে ধরল।

কাকাবাবু স্টেনগানটা রেখেছেন খানিকটা দূরে। সেটা যে-কোনও উপায়ে হাতে নিতেই হবে। তিনি লোকটির বুকে একটা ঘুসি কষাতেই সে ছিটকে গেল।

কিন্তু সে-লোকটিরও গায়ের জোর কম নয়। সে আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু একপাশে সরে গিয়ে দৌড় লাগালেন।

লোকটাও স্টেনগানটা দেখতে পেয়ে গেছে। সেও ছুটে গেল সেদিকে। কাকাবাবু খোঁড়া পায়ে দৌড়োচ্ছেন, তাঁর আগেই লোকটা প্রায় পৌঁছে গেল স্টেনগানটার কাছে। শেষ চেষ্টা

হিসেবে কাকাবাবু পা দিয়ে স্টেনগানটা ঠেলে দিলেন। কিন্তু এক পায়ে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন মাটিতে।

লোকটা স্টেনগানটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সেটা হাতে নিয়ে তার উঠে দাঁড়াতে যেটুকু সময় লাগল, তার মধ্যেই কাকাবাবু দ্রুত চিন্তা করলেন, এবার কী করবেন? তাঁর কাছে রিভলভারটা রয়েছে, তিনি লোকটাতে গুলি করতে পারেন। কিন্তু গুলির শব্দে তাঁবুর ভেতরের লোকগুলো বেরিয়ে আসবে। ওরা সবাই মিলে গুলি চালালে তিনি একা সামলাতে পারবেন কি? এদিকে এই লোকটাকে এক্ষুনি গুলি না করেও উপায় নেই।

তিনি রিভলভারটা বার করার আগেই একজন লোক ছুটে এসে একটা বড় ছুরি বসিয়ে দিল লোকটির ঘাড়ে।

লোকটি বিকট চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল।

কাকাবাবু দেখলেন, ছুরি মেরেছে শঙ্কর রায়বর্মন।

তিনি লাফিয়ে এপাশে চলে এসে স্টেনগানটা নিজের হাতে নিয়ে রিভলভারটা দিলেন শঙ্কর রায়বর্মনের হাতে। বললেন, "আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে। ওর চিৎকার শুনে অন্যরা বেরিয়ে আসবে। বেরোলেই তুমি গুলি চালাবে—"

কাকাবাবু গোলা-বারুদ-ভরা তাঁবুটার দিকে গুলিবর্ষণ শুরু করে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ফোরণ শুরু হল, পেট্রলের আগুন এগোতে লাগল দ্বিতীয় তাঁবুটার দিকে। অন্য লোকগুলো অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরোবার আগেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "শঙ্কর দৌড়োও!"

শঙ্কর রায়বর্মন তবু দাঁড়িয়ে পড়ে গুলি চালাচ্ছিল, কাকাবাবু তার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন পেছন দিকে।

গৌতমকাকুও নেমে এসেছেন গাড়ি থেকে।

কাকাবাবু বললেন, "শিগগির ফিরে চল, গৌতম। আমাদের কাজ হয়ে গেছে। গাড়ি স্টার্ট কর।"

শঙ্কর রায়বর্মন ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। গৌতমকাকু তাঁকে তুলে কাঁধের ওপর নিয়ে পৌঁছে গেলেন জিপটার কাছে। কাকাবাবু উঠে বসলেন পেছনের সিটে।

কানফাটানো শব্দে গোলাগুলি ফাটছে, আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে দুটো তাঁবু। এক-একটা আগুনের হলকা হাউইয়ের মতন উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

গাড়িটা চালাতে-চালাতে গৌতমকাকু বললেন, "আমি এর মধ্যে একটা কাজ করেছি। মাটিতে নালা খুঁড়ে ওরা যে তার বসিয়েছিল, সে তার আমি কেটে দিয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "খুব ভাল করেছিস। ওটা আগেই করা উচিত ছিল, আমার মনে পড়েনি। যাই হোক, ওরা আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।"

গৌতমকাকু বললেন, "শঙ্কর ছেলেটার সাহস আছে। ঠিক আধ ঘণ্টা হতে-না-হতেই ও এই অবস্থাতেও গাড়ি থেকে নেমে তোকে খুঁজতে গেল। হাতে শুধু একটা ছুরি।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক সময়ে গিয়ে এক হিসেবে ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমার একটা প্রধান দুর্বলতা, আমি সামনাসামনি কাউকে গুলি করে মারতে পারি না। আমার হাত কাঁপে। ওই লোকটা স্টেনগানটা তুলে নিলে আমায় শেষ করে দিত। তবে ওরা আজ খানিকটা অসাবধান ছিল, একে তো খুব বৃষ্টি হয়েছে, তার ওপর দারুণ শীত, গায়ে কম্বল জড়িয়ে ছিল। এইরকম রাতে কেউ ওদের আক্রমণ করবে, ওরা কল্পনাই করেনি।

গৌতমকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের সবক'টা কি আগুনে পুড়ে মরবে?"

কাকাবাবু বললেন, "তা নিশ্চয়ই না। এদিক-ওদিক পালাবে। তবে ওদের গোলাবারুদ শেষ। এখন ওদের খুঁজে বার করার দায়িত্ব পুলিশ বা আর্মির।"

গৌতমকাকু বললেন, "সামনে কিছুটা দূরে আলো দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, গাড়ির আলো। একটা না, কয়েকটা।"

কাকাবাবু বললেন, "বিস্ফোরণের আওয়াজ বহুদূর পৌঁছেছে বোধ হয়। নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "পুলিশের গাড়ি যদি হয়... আমাকে এখানে নামিয়ে দেবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে এখানে নামিয়ে দেব মানে ? অসম্ভব!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "আমাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে চান ?"

গৌতমকাকু বললেন, "পুলিশের কাছে নিজেই ধরা দাও না বাপু! তা হলে কম শাস্তি হবে। কতদিন আর রাজাগিরি চালাবে। শেষে একদিন বেঘোরে মরবে।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "কিছুতেই না। আমি জান দেব, তবু পুলিশের কাছে ধরা দেব না।"

ফস করে সে রিভলভারটা বার করে গৌতমবাবুর গলায় ঠেকিয়ে বলল, "গাড়ি থামান।"

কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "খবরদার, স্টেনগানটায় হাত দেবেন না। আমি গুলি চালাব।"

গৌতমকাকু ফ্যাকাসে গলায় বললেন, "এ কী, তুমি এখনও আমাদের মারতে চাও!"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "দরকার হলে মারতেই হবে!"

কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, "গুলি চালাবে ? তখন এলোমেলো ভাবে ক'টা গুলি চালিয়েছ, তা গুনেছ ? চেম্বারে আর গুলি নেই। নতুন গুলি ভরতে হবে না ? এই জ্ঞান নিয়ে তুমি যুদ্ধ করবে ?"

শঙ্কর রায়বর্মন দারুণ অবাকভাবে বলল, "গুলি নেই ?"

সে রিভলভারটা জানলার বাইরের দিকে ফিরিয়ে ট্রিগার টিপে পরীক্ষা করতে গেল। দারুণ শব্দে বেরিয়ে গেল একটা গুলি।

ততক্ষণে পেছন দিকে থেকে কাকাবাবু সাঁড়াশির মতন দু' হাতে তার গলা টিপে ধরে বললেন, "ওই একটা বাকি ছিল। এবার রিভলভারটা পায়ের কাছে ফেলে দাও!"

গৌতমকাকু বললেন, "বাপ রে বাপ! ওর মধ্যে একটা গুলি আছে জেনেও রাজা তুই ওকে ধোঁকা দিতে পারলি ? আমার তো এই শীতের মধ্যেও ঘাম বেরিয়ে গেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "লড়াইয়ের নিয়মকানুন শিখতে ওর আরও অনেকদিন লাগবে। ওহে রাজামশাই, তোমাকে জিপ থেকে নামিয়ে দিতে চাইনি, কারণ, তুমি আহত শরীর নিয়ে হেঁটে হেঁটে কতদূর যাবে ? তোমাকে পুলিশের হাতেও তুলে দিতে চাই না, কারণ দেশের শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তুমি আমাদের পাশে থেকেছ। আমরা নেমে পড়ে, এই জিপটাই তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি এবার পালাতে পারো তো পালাও। গৌতম, গাড়ি থামা, আমরাই বরং নেমে পড়ে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করি!"

শঙ্কর রায়বর্মন একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ফিসফিস করে বলল, "আমি আপনাকে মারতে চেয়েছিলাম, তবু আপনারা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন ? গাড়িটাও দিচ্ছেন ?"

গৌতমকাকু বললেন, "শোনো, শোনো। মানুষকে কী করে ক্ষমা করতে হয় শেখো। তবে এমনি এমনি ছাড়া হবে না। তুমি আমাদের তোমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে বাধ্য করেছিলে। এখন চটপট আমার আর রাজার পা ছুঁয়ে প্রণাম করো।"

শঙ্কর রায়বর্মন ঝপ করে নেমে এসে দু'জনের পায়ে হাত দিল।

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কয়েকটা থাপ্পড়ও পাওনা ছিল। এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। মহাদেবীকে গিয়ে বোলো, তুমি বাজি হেরে গেছ। কী বাজি ছিল ?"

শঙ্কর রায়বর্মন মাথা নিচু করে বলল, "সে আপনাদের বলা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "বলে ফেলো, বলে ফেলো। লজ্জা কী ? দেরি কোরো না, পুলিশের গাড়ি আর বেশি দূরে নেই।"

শঙ্কর রায়বর্মন বলল, "বাজি হয়েছিল, কাকাবাবু যদি পালাতে পারে, তা হলে আমাকে মহাদেবীর পা ধোয়া জল খেতে হবে।"

গৌতমকাকু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কাকাবাবু বললেন, "আগেকার দিনে বউরা স্বামীদের পা ধোয়া জল খেত। একালে তুমি না হয় স্বামী হয়ে তোমার বউয়ের পা ধোয়া জল খাবে একদিন। মন্দ কী! নাও, এবার পালাও!"

শঙ্কর রায়বর্মন জিপে উঠেই স্টার্ট দিয়ে সেটা ঘুরিয়ে নিল। তারপর মিলিয়ে গেল জঙ্গলে।

কাকাবাবুর দুটি ক্রাচই গেছে। স্টেনগানটা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালেন।

তিনখানা গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে এগিয়ে আসছে এদিকে।

প্রথম গাড়িতেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সন্তু, জোজো আর আমজাদ আলি। আর হাতকড়া বাঁধা নীলকণ্ঠ মজুমদার।

সার্কিট হাউসে সন্তুদের না দেখে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ নিতে শুরু করেছিল। শহরের মধ্যে বইয়ের দোকানের সামনে আমজাদ আলির জিপটা দেখেই তারা চিনতে পারে। ঠিক যখন নীলকণ্ঠ মজুমদার আমজাদ আলিকে গুলি করতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভেতরের ঘরটায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে পুলিশ।

জেরার চোটে নীলকণ্ঠ মজুমদার সব স্বীকার করেছে। সে সত্যিই শঙ্কর রায়বর্মনের ভাই। শহরে বসে, বইয়ের দোকানের মালিক সেজে সে গুপ্তচর চক্র চালায় আর অস্ত্র সংগ্রহ করে।

তাকে নিয়ে আসা হচ্ছিল শঙ্কর রায়বর্মনের জঙ্গলের ডেরা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য। নীলকণ্ঠ মজুমদারকে ধরে রাখা হয়েছে জানলে শঙ্কর রায়বর্মন বন্দিদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। ভাইকে সে সত্যি ভালবাসে।

দু' গাড়ি পুলিশ সমেত ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িটা অন্যদিকে যাচ্ছিল, বিস্ফোরণের শব্দ শুনে এদিকে ঘুরে এসেছে।

কাকাবাবু আর গৌতমকাকু দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার মাঝখানে।

তাঁরা দু' হাত তুলে গাড়ি থামালেন। সন্তু আর জোজো তড়াক করে নেমে ছুটে এল। কাকাবাবু ওদের দু'জনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "দ্যাখো, এবারেও মরিনি। কী করে যে বেঁচে যাই, কে জানে! আমাকে ধরে ধরে নিয়ে চলো। পায়ে বড্ড ব্যথা!"

রণবীর গুপ্তও নেমে এসে বললেন, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি তো? জঙ্গলের মধ্যে দারুণ আগুন জ্বলছে, বোমা ফাটছে, এসব কী ব্যাপার? এও কি শঙ্কর রায়বর্মনের কীর্তি নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "না। সেসব অনেক কথা, পরে বলব। পেছনের গাড়ির লোকদের বলো, যদি আগুন নেভাবার ব্যবস্থা করতে পারে। আজ আর কাউকে ধরা যাবে বলে মনে হয় না। আমাদের কোনও বাংলোয় নিয়ে চলো। বিকেল থেকে এক কাপ চা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। এখন একটু চা খেতে হবে।"

গৌতমকাকু বললেন, "এত রাতে তুই চা খাবি রাজা? আমার দারুণ খিদে পেয়েছে। আমি ভাত খেতে চাই। ক'দিন ধরে শুধু রুটি আর রুটি খাইয়েছে। এখন আমার খেতে ইচ্ছে করছে, গরম গরম ভাত আর ডাল আর বেগুন ভাজা..."